রসায়ন

শ্রীরাসেন্দু দত্ত

মূল্য—১৲ টাকা।]

[মহালয়া, ১৩৩৯ সাল

প্রকাশক ঃ—
সিংহ প্রিন্টিং এ্যাণ্ড্ পাব্লিশিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীশচীন্দ্ররঞ্জন দাস বি,এ, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

(প্রথম সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড্ সন্স্।
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড্ সন্স্ প্রভৃতি।

ভূমিকা

'রসায়ন' আমার চতুর্থ গল্পপুস্তক। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার শেষ গল্পের বই 'ভুলের ফল' প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং রসায়নের জন্য আমাকে চারটি নূতন গল্প লিখিতে হইল। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে 'বাঘ-নাচ' পালাটি একটি অতি প্রাচীন উৎসব-কাহিনী। ইহার গল্পাংশের মূল্য না দিলেও প্রাচীন উৎসবের পরিচয় হিসাবে ইহার একটা স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে ; পালাগান সংগ্রহের প্রধান উদ্যোক্তা রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া যখন 'পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা' সম্পাদন কার্য্যে সাহায্য করিতাম সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের উক্তরূপ পালাগান সংগ্রহের চেষ্টা করি। প্রথম প্রয়াসেই নিজের গ্রামে ঐ-টি সংগৃহীত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে যৎসামান্য মূল্যে ক্রয় করিবেন বলেন —এবং হয় ত তখন বিক্রয়-ও করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু সে লোভ সংবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম বলিয়া আজ আমার স্বগ্রামস্থ এই ক্ষুদ্র কৌতুক-নাট্যটি পাঠক-পাঠিকাদের গোচর করিতে সমর্থ হইলাম।

'সরল-পল্লীজীবন' গল্পটি 'প্রত্যাবর্ত্তন' নামে অধুনা-বিলুপ্ত 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে অস্পৃশ্যতা-প্রথা উচ্ছেদের জন্য, মহাত্মার আন্তরিক চেষ্টার ফলে, দেশময় যে সাড়া পড়িয়াছে তাহা যদি হিন্দুসমাজের সৌভাগ্য-ক্রমে সফল ও স্থায়ী হয় তবে চার বৎসর পূর্ব্বে এই গল্পে আমি যে অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার আর প্রয়োজন হইবে না। আমি মনে মনে প্রকৃতই তথা-কথিত নীচ-জাতীয়দের প্রতি তথা-কথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের এই নাক-সিট্‌কানো দূর্ দূর্ ব্যবহারের সমর্থন করি না। জীবনে বহুবার এই তথা-কথিত নিচ জাতীয়দের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি। বহুবার অনুভব করিয়াছি যে অন্তঃকরণের উদারতায়, মহত্ত্বে ও সারল্যে ইহারা তথা-কথিত

উচ্চ-জাতীয়দের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে বরং শেষোক্তদের মধ্যেই অধিকাংশস্থলে এই সব হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

পুরাতন রচনার মধ্যে বাকী রহিল 'চিঠির নেশা' গল্পটি। ইহা আমার সর্ব্বপ্রথম গল্প-রচনা। সে আজ ১৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখন আমার বয়স মাত্র পঞ্চদশ। কবিতা লিখিতে লিখিতে হঠাৎ একটা গল্পের প্লট্ মাথায় আসিল। স্কুলের 'নক্ষী-ছেলের' পক্ষে কবিতা রচনাই যথেষ্ট পাপ। গল্পটি শেষ করিয়া কয়েকজন সহপাঠীকে গোপনে দেখাইলাম; তাহারা কবিতা পড়িতে চাহিত না; গল্পটি বেশ উপভোগ করিতে করিতেই পড়িল। বুঝিলাম পাঠক-সংগ্রহের পক্ষে কবিতা যেন ধর্ম্মপ্রচারক,—অর্থাৎ ধর্ম্মের বক্তৃতা শুনিতে আরম্ভ করিলেই শ্রোতার দল পাৎলা হইতে থাকে; কিন্তু গল্প সে বিষয়ে যেন বায়োস্কোপের ফিল্ম্; 'শ্রীকৃষ্ণের আলুর দম ভক্ষণ' হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাই দেখাও না কেন, টিকিট-ঘরে ভীড় হইবেই! 'চিঠির নেশা' গল্পটির প্রথমকার রচনা যেমন ছিল হুবহু সেই রকমই রাখিয়াছি।

ছোট গল্পের বইয়ের দুর্দ্দশা এদেশে এখনো বর্ত্তমান, যদিও ছোট গল্পের পাঠক কবিতার পাঠকদের অপেক্ষা অনেক বেশী। এখনো "ওঃ ছোট্ট গল্পের বই! উপন্যাস নয়?" একথা প্রকাশক, খরিদ্দার, লাইব্রেরীর মেম্বার, সকলেরই মুখে। এ কথার অনুরূপ কথা 'ভুলের ফুল' ভূমিকায় লিখিয়াছি; কেহ কেহ উত্তরে বলিয়াছেন, রবীন্দ্র-নাথের ছোট-গল্প-গুচ্ছের মত, অথবা শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' প্রভৃতি গল্পের মত গল্প কোথায় যে ছোট-গল্পের পাঠক হইবে? আমি বলি যে বঙ্গদেশে দৈনিক যতগুলি শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহাদের চতুর্গুণ সংখ্যায় যে প্রত্যহ ঝুড়ি ঝুড়ি 'উপন্যাস' বাহির হইতেছে, সেগুলিই কি প্রত্যেকটি 'গোরা', 'শ্রীকান্ত', 'দত্তা', 'দেবদাস', হইতেছে? আমার এখনো দৃঢ় বিশ্বাস যে মাসিক-পত্রের চাহিদা না থাকিলে অনেক গল্পই রচিত হইত না। প্রভাতকুমারের নাম ত' সাহিত্যিকেরা ও জন-সাধারণ

ভুলিতেই বসিয়াছে। তাঁহার অপরাধ তিনি মনস্তত্ত্বমূলক গভীর ভাবপূর্ণ গল্প লেখেন নাই। আজকাল যাঁহারা ২॥০ টাকায় গল্প বিক্রয়ের জন্য হইয়া 'আয় গল্প আয়' করিতে করিতে পাতার পর পাতা রাবিশ লিখিয়া প্রধান প্রধান মাসিক পত্রের পাতাগুলি ভরাইতেছেন, তাঁহাদের গল্প—এবং হাস্যরসামৃত ধারায় অভিষিক্ত প্রভাতকুমারের গল্প, কোন্‌টি বেশী উপভোগ্য কে বলিবে। অতি-কাঁচাদের দল আমাদের রুচি পচাইয়া দিয়াছে। বিলাতী গল্পের গর্-হজম্ তাহারা উদ্গিরণ করিয়া কাগজ ও পুস্তক ভরাইয়া ফেলিতেছে। পাঠক-পাঠিকারা মাতিয়া উঠিতেছেন! স্বচ্ছ হাসি, নির্দ্দোষ কৌতুক, আজকালকার 'প্রতিভাবান' গল্প লেখকেরা 'তরল' বলিয়া অবজ্ঞা করেন। চাই—সাইকলজি, ইটারন্যাল্ ট্রায়াঙ্গল্; চাই—পেপ্! বালিগঞ্জ, ট্যাক্সি, গিরিডি, এন্তার টাকা ও কলেজে-পড়া অভিভাবকহীন মেয়ে এবং বিকৃত-রুচি ইঙ্গবঙ্গীয় যুবক না হইলে আর আপ্-টু-ডেট্ গল্প হয় না। অথচ এই সব গল্পের লেখকরা বালিগঞ্জের বাড়ী ইত্যাদি ইত্যাদির সহিত প্রত্যক্ষভাবে কতটা পরিচিত তাহা তাহাদের রচনার অস্বাভাবিকতায় প্রতিমূহূর্ত্তে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমার মনে হয় যাহার সহিত পরিচিত ও যাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করি তাহা লইয়া থাকিলেই রচিত কথা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি অধিকতর হইয়া থাকে। কৃত্রিমতা কখনো জয়ী হয় না।

অতি-তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতিভা আছে। যদি স্থির ভাবে সংযমের সহিত সাধনা করিবার ধৈর্য্য তাঁহারা না স্বীকার করেন তবে সে প্রতিভায় আমাদের সাহিত্যের কোনো কাজ হইবে না। প্রয়োজনের তাগিদে 'ম্যানুফ্যাক্‌চারিং'-স্কেলে গল্প-রচনা করিলে সব দিক যে বজায় রাখা যায় না তাহা অবশ্য স্বীকার করি। ইতি—

শ্রীরামেন্দু দত্ত

১২ই আশ্বিন ১৩৩৯ সাল।

পরম ভক্তিভাজন

ডাক্তার—শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ,

এম-ডি, (ইউ, এস্, এ,)

মহোদয়েষু—

আপনার অশেষ গুণাবলী আমায় মুগ্ধ করিয়াছে। আপনার সুন্দর হৃদয়ের পরিচয়-লাভে আমি যুগপৎ পুলকিত ও বিস্মিত হইয়াছি। আপনার স্নেহ-সহানুভূতি আমার জীবনকে ধন্য করিয়াছে। আপনার গুণগ্রাহিতাও অসাধারণ। দিবার মত আমার যদি কিছু থাকে তবে তাহা আছে আমার মনে,—আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। এ বইখানি আপনাকে উৎসর্গ করিয়া আমি ধন্য হইলাম—এই কার্য্য আমার অন্তরের শ্রদ্ধার সামান্য নিদর্শন মাত্র। ইতি—

"রামেন্দু"

১০ই আশ্বিন ১৩৩৯
কলিকাতা।

উপহার

সূচী।

মধুরেণ সমাপয়েৎ ১
'ফ'-এ 'এ'-কার 'ম' ১৫
সরল পল্লীজীবন ২১
বাঘ-নাচ ৩৫
চিঠির নেশা ৫০
৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ ... ... ৬১
লেডিজ্ রিষ্ট্-ওয়াচ্ ৭৫

"মধুরেণ সমাপয়েৎ"

কুড়ি বৎসরের টুক্‌টুকে গ্র্যাজুয়েট হীরেন চ্যাটার্জ্জি বিনোদ মেমোরিয়েল হাইস্কুলের থার্ড্ মাষ্টার। বেলা দশটায় স্কুলে যাইবার পথে এবং বিকাল চারটায় স্কুল হইতে ফিরিবার সময় তাহাদের গলির মোড়ের ছোট্ট দোতলা বাড়ীটির বারান্দা হইতে একটি বালিকা তাহাকে কৌতূহলভরে প্রত্যহ নিরীক্ষণ করিত। "নারকুলে" কুলের মত সুডৌল তাহার গৌরবর্ণ মুখখানিতে আঙুরের সরসতার আভাস পাওয়া যায়; কুরঙ্গের মত আয়ত নয়নে মধুর হৃদয়ের আকুলতা খেলিয়া বেড়ায়; ঈষৎ বিকশিত অধরোষ্ঠে সুধার সন্ধান মিলিতে পারে; এই রকম আরো কতকগুলি কবিত্বমাখা কথা সে ঐ বালিকা সম্বন্ধে আমাদের কাছে রোজই বলিত। প্রভাতের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর হীরেনকে লইয়া এই সম্বন্ধে আমরা কত ঠাট্টা করিতাম। একদিন কিন্তু সে আর আমাদের আড্ডায় আসিল না। অথচ সেইদিন সকালেও তাহাকে শ্রীমানী মার্কেটে চাকরের সঙ্গে বাজার করিতে দেখিয়াছিলাম। অসুখ তাহার নিশ্চয় হয় নাই। বাড়ীতে ত এক মা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নাই; তবে কি তাহার

মায়েরই অসুখ ? আমাদের মজলিস্ ভাল জমিল না। "জলি" (Jolly) তাহাকে সেদিন কি বলিয়া 'টু' দিল, কোন্ চোখ টিপিয়া ইসারা করিল, এ সমস্ত না শুনিতে পাইয়া আমাদের যেন পেট ফাঁপিবার উপক্রম হইল : পরের দিন যথাসময়ে হীরেন হাজির।

"কি হে স্যাটো, ব্যাপার কি ? কুমারী "জলি" বাড়ী ফেরবার পথে তোমাকে kidnap (অপহরণ) ক'রেছিলেন না কি ?"

"Exactly ! (ঠিক তাই) একেবারে পথ আগুলে 'যেতে নাহি দিব' ভাব। বল্লাম কি ব্যাপার ? বল্লে বাড়ীতে চলুন। আমি ত অবাক্। শুনলুম বিবিধ মাসিক পত্রে আমার যে কবিতা বেরোয় সেগুলি নাকি তাদের বাড়ী শুদ্ধ সকলের ভালো লাগে ; জলিকে কথায় কথায় একদিন আমার নামটা বলেছিলাম তাইতেই এই বিপত্তি। সে আবার 'মৌচাক' 'শিশুসাথী' পড়ে কি না ? "

"হ্যারে, তোর মানসী 'মৌচাক-শিশুসাথী' পড়ে ? খুকি নাকি ? আমরা জানতুম সে 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' প্রভৃতি বড় বড় সাব্জেক্ট্ নিয়ে মাথা ঘামায় !"

হীরেন মুখখানাকে উদ্দীপ্ত হাস্যে উজ্জ্বল ক'রে বল্লে "আরে দূর, তার বয়েসটা বুঝি তোদের বলি নাই ? মোটে এগারো বছরের মেয়ে তা আবাব উপন্যাস পড়্বে কি !"

আমাদের সকলের মুখ লজ্জায় পাংশু হইয়া গেল। একটা এগার বছরের মেয়েকে লইয়া হীরেন আজ দিনের পর

দিন আমাদিগকে রোমান্সের গল্প শুনাইতেছে আর আমরাও অতি বড় বেয়াকুবের মত সেই প্রতারণা পরম ঔৎসুক্যভরে গলাধঃকরণ করিতেছি! আমরা সকলেই হীরেনের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলাম।

—দুই—

হীরেন সেই দিন হইতে আর কোনোদিন জলি'র সম্বন্ধে একটি কথাও বলে নাই। আমরাও দু' একদিন তাহাকে ঠাট্টা করিয়া অবশেষে তাহার প্রেয়সীর কথা আর তুলিতাম না।

প্রভাতদের বৈঠকখানায় যতগুলি বন্ধুর সমাগম হইত তন্মধ্যে আমিই হীরেনের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলাম। সুতরাং প্রকাশ্য বৈঠকে যখন রোমান্স্‌টির মূলে আকস্মিক ভাবে নির্দ্দয় কুঠারাঘাত করা হইল, ঠিক তখন হইতেই হীরেনের ও আমার মধ্যে গোপনের অন্তরালে তাহার যবনিকা উঠিয়া গেল। আমার প্রভাতের বৈঠকখানায় যাওয়া প্রায় একরূপ বন্ধ হইল। সন্ধ্যা হইলেই হীরেন আসিয়া বলিতে বসিত কিরূপে 'একাদশী' জলি পূর্ণশশী হইয়া তাহার হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করিতেছে। পৌষ-পার্ব্বণে পিষ্টক, বিজয়া-দশমীতে বৃহৎ ভোজ, দোলের দিনে হোলী-সুখের সহিত মিষ্টমুখ, বড়দিনে লুচি-মাংস, ছুটির দিনে বায়োস্কোপ, সার্কাস, ইত্যাদির ফর্দ্দ দিয়া হীরেন আর কোনো সন্দেহই রাখিল না যে এই গল্পের পরিণতি কোথায়। জলি'র বাড়ীর সকলেরই যে এই প্রিয়দর্শন হীরেনটিকে পছন্দ হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বিস্মিত হইবার কিছু না থাকিলেও আমি আশ্চার্য্যান্বিত হইতেছিলাম যে হীরেনের মা, পুত্রটিকে এত 'ফ্রি-লভ্' করিবার সুযোগ দেন কি করিয়া? হীরেনের মাকে

আমি যতদুর দেখিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহাকে এত সেকেলে বলিয়া মনে হইত যে এই 'জলি'-চুরী তাঁর কখনই পছন্দ হইবে না জানিতাম।

হীরেনের মাতৃভক্তি যতটা না হউক, যে পরিমাণ কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল তাহাতে সে-ও যে তাহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন এই মায়ের বিনা সম্মতিতে বিবাহ করিবে না একথাও নিশ্চিত জানিতাম। তাই হীরেনকে আমি সময় থাকিতে সাবধান হইতে বলিয়াছিলাম। সে কিন্তু আমার হিতোপদেশ পালন করিবার কোনো লক্ষণই দেখাইল না।

এই ভাবে পৌষ-পার্ব্বণের পর দোল, দোলের পর বিজয়া-দশমী, বিজয়ার পর সার্কাস, কার্ণিভ্যাল্, তিনটি চক্র ঘুরিয়া আসিল। সুতরাং একাদশী জলি দেবী তখন হইলেন চতুর্দ্দশী। হীরেন তখন পূর্ণিমার স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছে!

হীরেনের জননী পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া এ দিকে নিজের পছন্দমত পুত্রবধূর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি জানিতেন বটে যে পুত্ররত্ন কোনো একটি নাবালিকার প্রেমে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তিনি সে কথাকে মনের মধ্যে মোটেই আমল দিতেন না। তিনি জানিতেন যে এই বিশাল কলিকাতা নগরীতে হীরেনের পক্ষে সর্ব্বরকমে উপযুক্ত, গান-বাজনা লেখাপড়ায় সুনিপুণা বহু পাত্রী আছে। তিনি সেইরূপ একটি কন্যার সন্ধানে দিবারাত্র যান-বাহনাদির সাহায্যে স্বীয় কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। হীরেনও এদিকে পরম নিরুদ্বেগে জলিকে লইয়া আজ চিত্রায়, কাল এশিয়াটিক্ সার্কাসে, পরশু বোট্যানিকাল গার্ডেনে যাইয়া জীবনের

সাদা পাতাগুলিকে ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত করিতে লাগিল। ফর্সা, কালো, মোটা, রোগা, ধনী, গরীব, সুন্দরী, অসুন্দরী, বহুপ্রকারের কন্যা দেখিয়া হীরেনের মা একদিন ক্লান্ত দেহে ও কিয়ৎপরিমাণ উৎসাহ-হীন মনে ঘরের 'লাইট' নিভাইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন। হীরেন একরাশ জলে ধোয়া সদ্য-ফোটা যুঁই ফুলের মত উৎফুল্ল ভাব লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। আজ সে এত সুখী যে আর অপেক্ষা করিতে চাহে না। ঘরে ঢুকিয়াই মাকে বলিল "মা, আজ কোথায় কোথায় গেস্‌লে?" মা উত্তর দিলেন "একটা রিক্সা ক'রে এই পাড়াতেই গিয়েছিলুম বাবা। নিতাই বল্‌লে মেয়েটি রূপে দুর্গা, গুণে লক্ষ্মী, গান-বাজনা লেখা-পড়া জানে। ও মা, গিয়ে দেখি রং ফর্সা বটে, মুখ-চোখও মন্দ নয় কিন্তু চেহারাটি যেন কুম্‌ড়ো! যেমন বেঁটে, তেম্‌নি মোটা। ওই ঘটক ঘট্‌কীগুলোর কথায় আবার বিশ্বাস করে!"

হীরেন আজ ও-তরফ্‌ হইতে স্পষ্ট সম্মতি লাভ করিয়া আসিয়াছে; এক এক মুহূর্ত্ত তাহার কাছে এক এক বৎসর মনে হইতেছিল! সে বলিল "মা, অভয় দাও ত একটা কথা বলি।"

"বল্‌ না?"

"মা, এই গাঙ্গুলীদের সেই যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম তাকে একবার দেখে এসো না?"

* * * *

ইহার পর কি সব কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আর হীরেন আমায় বলে নাই; কারণ সেই দিন রাত্রেই, প্রায় এগারটার সময় সে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে আমার বাড়ী আসিয়া যথাসম্ভব সংক্ষেপে কেবল

ফলাফলটুকু বলিয়া গিয়াছিল। সে দরজায় ডাকাতদের মত ধাক্কা দিয়া আমাকে কাঁচা ঘুম হইতে উঠাইয়া বলিল "ওরে ক্যাব্‌লা! মার্‌ দিয়া!" ক্যাব্‌লা বলিয়া সম্বোধন করিলে আমি যে মারাত্মক রকমের চটিয়া যাই তাহা সে ভাল রূপেই জানিত; অথচ আমার "সুধাকান্তে"র মত সুন্দর নাম থাকা সত্ত্বেও সে যখন "ক্যাব্‌লা" বলিয়া সম্বোধন করিল, তখনই আমি তাহার মনের দুরন্ত অবস্থার ত্বরিত পরিচয় পাইলাম। সেইজন্যই তুচ্ছ বিষয়টাকে গ্রাহের মধ্যে না আনিয়া অনুরূপ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রে, ক্যা মার্‌ দিয়া?"

তারপর সে আমায় যাহা বলিয়াছিল তাহার কতকটা পাঠকপাঠিকাদের আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাকীটা এই:—

তাহার মা, 'জলি'র সহিত তাহার সম্বন্ধ করিতে রাজী হইয়াছেন।

—তিন—

আজকের রবিবারটা আমার ব্যর্থ হইয়াছে। অফিসে সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি; সপ্তাহের শেষে নিতান্ত একটি করিয়াই রবিবার। শতকাজ থাকিলেও দিবানিদ্রারূপ বিলাস হইতে এইদিন নিজেকে বঞ্চিত করি না। আজ কিন্তু বাল্য-বন্ধু হীরেনের অবস্থা দেখিয়া সেই পরম প্রিয় দিবানিদ্রাকেও বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সে আজ সকালে আমার কাছে প্রায় কাঁদো-কাঁদো মুখে হাজির; এক কাপ্‌ চায়ের ওপর যখন কিছুতেই তাহাকে আধখানা 'ক্রীম ক্র্যাকার'

খাওয়াইতে পারিলাম না তখনই বুঝিলাম যে, এমন কোনো ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে গণেশ ঠাকুরকেও পেটের চিন্তা ভুলাইয়া দিয়াছে।

যাহা হউক, যখন হীরেন মুখ খুলিল তখনই বুঝিলাম যে, যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। হীরেনের মা মেয়েকে দেখিয়া ও তাহারা "ভঙ্গ" শুনিয়া সম্বন্ধ নাকচ করিয়া দিয়াছেন। হীরেন আমাদের কাছে প্রত্যহ যে বর্ণনা দাখিল করিত তাহাতে জলিকে যে, কেহ দেখিয়া অপছন্দ করিতে পারে ইহা আমাদের ধারণার বাহিরে ছিল। আজ তাই হীরেনকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাহার মা জলিকে অপছন্দ করিলেন কেন, সে বলিল "সে অনেক কথা"।—কিন্তু এই অনেক কথা সে আমাকে বলিয়া থাকিলেও একটি কথা সে আমাকেও গোপন করিয়াছিল ; সে কথা যথাস্থানে বলিব।

জলিরা "ভঙ্গ" এবং হীরেনরা "কুলীন", এই অতি প্রাচীন বাধা যে আজ বিংশ শতাব্দীতেও কত কঠিন ও অভ্রভেদী হইয়া থাকিতে পারে তাহা হীরেনের আজিকার দশা না দেখিলে ধারণা করা অসম্ভব। এই অতি 'rotten' (পচা) সামাজিক সংস্কার যে ভয়াবহ কুসংস্কার, সে কথা হীরেন আমকে বার বার বলিয়া বুঝাইতে লাগিল। আমিও বাস্তবিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম যে পাত্রপক্ষ কুলীন হইলে 'ভঙ্গে'র কন্যা গৃহে আনিতে এত আপত্তি কি থাকিতে পারে। হীরেন জননীকে বুঝাইতে কিছুমাত্র কসুর করে নাই। তিনি কিন্তু একে অতিমাত্রায় আচারনিষ্ঠা তদুপরি সামাজিক সমস্ত বিষয়েই অত্যন্ত গোঁড়া। আমরা তখন 'প্ল্যান্' আঁটিতে লাগিলাম কি করিয়া হীরেনকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করা যায়। অবশেষে একটা মতলব দু'জনেরই বেশ পছন্দ হইল। সকৃতজ্ঞ

হীরেন কার্য্য হাসিল হইলে আমাকে কিরূপে পুরস্কৃত করিবে তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া বাক্যহারা হইয়া পড়িল। অবশেষে বলিল তোমাকে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিয়ে দেবো; আমি বলিলাম, "মধুরেণ সমাপয়েৎ-টা" তোমারই জন্যে থাক্ আমাদের "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ" হ'লেই হবে।

যাহা হউক দিবানিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় মনটা যে রকম খারাপ হইয়া গিয়াছিল, এই প্ল্যান্ মাথায় আসায় তাহার কথঞ্চিৎ উপশম হইল। "শুভস্য শীঘ্রম্" এই প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া আমরা সেইদিন বিকালেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ফেলিলাম। তাহার পর হীরেনকে বলিলাম "যা, সন্ধ্যে হয়ে এল; তোর মা হয়ত সমস্ত দিন না-খেয়ে ব'সে আছেন।" হীরেনের সে কথাটা সত্যই খেয়াল ছিল না। শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

তাহার পরদিন সন্ধ্যায় হীরেন আমার কাছে আসিয়া বলিয়া গেল, "আমি ভাই যে রকম ব'লেছিলি, সেই রকমই ক'রছি; মাকে দেখ্লেই খুব মুখ ভার ক'রে ব'সে থাকি আর টানা-টানা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। মাথায় তেলও মাখি না; চুলও আঁচড়াই না।"

—চার—

হীরেনের মায়ের যেমন দেব-দ্বিজে ভক্তি, হীরেনের তেমনি ঐ জাতীয় সমস্ত দ্রব্যে ঘোর অভক্তি! এমন কি সে 'শীতলা-মায়ের পূজা হবে গো' অথবা কীর্ত্তনের নামে যে সব ভিখারী কর্ণপটাহের স্থিতিস্থাপকতা পরীক্ষা করে, তাহাদের ভিক্ষা দেওয়ারও বিরোধী। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে একদিন সকালে যখন হীরেনের মা সসঙ্কোচে আসিয়া তাহাকে

বলিলেন "বাবা একবার এদিকে আয় ত" তখন আসিবার কারণ উপলব্ধি করিয়া সে যে কাণ্ডটা বাধাইয়া বসিল তাহাকে যেন কেহ মাতৃভক্তির অভাব বলিয়া অনুমান না করেন।

সে মায়ের নির্দ্দেশমত বাড়ীর ভিতরে আসিয়া দেখিল উঠানের প্রায় মাঝখানে একখানা চেয়ারের উপর একজন পেশাদার হিন্দুস্থানী জ্যোতির্বী পরম সুখাসনে সমাসীন। দেখিয়াই তাহার পিত্ত শুদ্ধ জ্বলিয়া গেল। ঠিক এই ধরণের বহু মুর্ত্তিকে হেদুয়ার ফুটপাথের দুই ধার অলঙ্কৃত করিয়া সকাল সন্ধ্যা বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। এবং লোক বুঝিয়া এক পয়সা হইতে চার আনা পর্য্যন্ত দর্শনীর বিনিময়ে ইহারা যেরূপ অনর্গল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যায় তাহার শতাংশের একাংশও যদি ফলিত, তবে আজ পৃথিবীতে দুঃখী লোকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইত। এইরূপ ভণ্ড-জ্যোতিষীদের প্রতি হীরেনের একটা জাতক্রোধ ছিল। ক্ষুদ্র অক্ষিপুট দুইটি মিট্-মিট্ করিয়া এই বরাহ-মিহিরের বংশধর, "বাবুজীকো হাত্ ঠো দেখ্‌নে মাংতা" বলিতেই বাবুজীর হস্তের যে অংশের সাক্ষাৎ পাইল তাহা তাহার সামুদ্রিক-বিদ্যাচর্চ্চার পক্ষে অনুকূল হইবে না বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে উৰ্দ্ধ-চৈতন অবস্থায় পলায়ন করিল।

এ দিকে এমন চক্ষের নিমেষে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল যে হীরেনের মাতাঠাকুরাণী বাধা দিবার বা কিছু বলিবার অবকাশই পাইলেন না। জ্যোতিষী চলিয়া যাইবার পর তিনি প্রায় ক্রুদ্ধস্বরেই ছেলেকে বলিলেন "তোমরা বাপু লেখাপড়া শিখে যেন কি সব হয়েছ। দেব-দ্বিজে ভক্তি নাই, পাঁজি-পুঁথি গণনায় বিশ্বাস নাই, অতিথি-সজ্জনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার

নাই—এর চেয়ে মূর্খ হয়ে থাক্‌লে মাথা পরিষ্কার থাকে। এই যে ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে তাড়িয়ে দিলি, এর গুণাগুণ জানিস্? এসেছে আধঘণ্টা হবে, একটা পয়সা পর্য্যন্ত নিতে চায় নি, আমাকে মা-জননী-জগদ্ধাত্রী ব'লে, রাজপুত্রের মত ছেলের মা ব'লে গেছে, আর আমার 'রাজ পুত্তুর ছেলে' কি কীর্ত্তিটাই না দেখালেন! এই আধঘণ্টা ধ'রে এমন সব কথা বল্‌লে, যে কথা কোনো বাইরের লোক জানে না; তুইও হয় ত জানিস না এমন আমাদের কত সংসারের কথা ব'লে দিলে! বল্‌লে তোর হাত দেখ্‌লে তোর সম্বন্ধে সব ব'লে দেবে; কবে বিয়ে হবে, কেমন বউ হবে সমস্ত! তা তুই সব মাটি ক'রে দিলি।"

উত্তরে হীরেন বলিল "হ্যাঁ, মা, তুমিও যেমন! তোমাকে যে একটু খোসামোদ ক'রবে তুমি অম্‌নি তারই বশ হবে। বিশেষ ক'রে যখন তোমার ছেলের প্রশংসা ক'রেছে, আর রক্ষে আছে! আর ও অতীত ঘটনা বলা, ওসব জোচ্চুরী; কোথা থেকে পাশের বাড়ীতে কা'কে জিগ্যেস্ ক'রে এসে এখানে গণৎকার সেজেছে! ওসব ভণ্ডদের কথায় আবার বিশ্বাস করে?"

আর কেহ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, হীরেনের মা যে করিতেন তাহার পরিচয় শীঘ্রই পাওয়া গেল। পরদিন হীরেন যখন বিনোদ মেমোরিয়েলে [illegible]টিয়া মানুষ করিতে ব্যস্ত তেমন সময় সেই জ্যোতিষী আবার তাহার মায়ের কাছে হাজির। সে আসিয়াই বলিল "মা, কাল আপনার ছেলের মুখ দেখে মনে হ'ল তার বড় বিপদ উপস্থিত, তাই অত অপমানের পরও আজ আপনাকে সে খবর দেবার জন্যে না এসে থাকতে পারলাম না।" বলা বাহুল্য গণৎকার ঠাকুর হিন্দির সঙ্গে ভাঙা বাঙ্গ্‌লা

মিশিয়ে যা বল্‌ছিলেন আমি তাকে সহজ-বোধ্য ক'রে দিচ্ছি। হীরেনের মা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন "কি বিপদ বাবা?"

"তা জানি না তবে আপনার হাতটা আর একবার দেখি,—আচ্ছা আপনার ছেলের বিয়ে হয়েছে?"

"না বাবা, ঐ নিয়েই ত যত গোল!"

"তবেই হয়েছে; কেন, ছেলে কি বিয়ে করতে চায় না?"

"চায়, তবে যেখানে চায় সেখানে বি'য়ে হ'তে পারে না।"

"আচ্ছা, আপনার ছেলের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কোনোদিন কিছু খারাপ দেখেছেন?"

"না বাবা, সে বিষয়ে আমার ছেলের তুলনা নাই।"

"দুঃখ করবেন না মা, আপনার ছেলের উন্মাদ-লক্ষণ রেখা রয়েছে; আপনার ছেলে কুচরিত্র হয়ে উন্মাদ হ'তে পারে। বিবাহ হ'লে হয় ত ফির্‌বে। আপনি বিবাহে বাধা দেবেন না। ছেলে যেখানে চায় শীগ্রি বিয়ে দিয়ে দিন। ওর স্ত্রীর ভাগ্য ভাল ও স্ত্রীর সৌভাগ্যের জোরে কোনো দোষ ওকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু মা আর সময় নাই, এই সাম্‌নের ১৫ই বৈশাখের মধ্যে যেমন ক'রে পারেন বিয়ে দিয়ে দিন নইলে ধনুরাশিতে রাহুর সঞ্চার প'ড়ে গেলে আর রক্ষা ক'রতে পারিবেন না।"

"তাইত, বাবা, এ যে বড় সাংঘাতিক কথা বল্‌লে। হ্যাঁ বাবা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে কিছু হয় না? আমি তোমায় কিছু টাকা দেবো তুমি যদি সেটা আমার জন্যে করো।"

"দেখুন মা, আমি পেশাদার গণৎকার বটি, কিন্তু আপনার মত ধার্ম্মিক মহিলার কাছে ঠকিয়ে পয়সা আদায় করতে চাই না। বরং

কিছু চেয়ে নেবো। দেখুন, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ফলে মানুষের যে সুখ-দুঃখ আসে কর্ম্মফলের দ্বারা তার কতক খণ্ডন করা যায়; গ্রহ-শান্তিতেও কিছু ফল হয়; কিন্তু যেখানে বিধিলিপির বিধানের মধ্যেই প্রতীকারের ব্যবস্থা আছে সেখাতে এসবের কিছুই দরকার হয় না। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ঐখানেই বাহাদুরী। আমার শাস্ত্রজ্ঞান আমাকে ব'লে দিচ্ছে যে আপনার ছেলের কোনো কারণে এই সময় উন্মাদ হবার আশঙ্কা আছে, তবে স্ত্রীর ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হ'লে সে আশঙ্কা থাক্‌বে না। এবং যদি ঐ রাহুসঞ্চারের আগে অর্থাৎ ১৫ই বৈশাখের আগে বিবাহ হয় তবে যিনিই আপনার পুত্রবধূ হ'ন তিনিই সর্ব্ববিষয়ে আপনাদের সংসারের কল্যাণকারিণী হবেন। এখন আপনার ছেলে যেখানে বিয়ে করতে চান অথবা অন্য যেখানে সম্ভব হয় সেইখানেই আপনার ছেলের বিয়ে দিয়ে ফেলুন।"

হীরেনের মা রীতিমত চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। সেদিন ২রা বৈশাখ; ১৫ই বৈশাখের আগে বিবাহের মাত্র একটি দিন আছে ৭ই। এত অল্প-সময়ের মধ্যে কোথায় কন্যা পাওয়া যায়; বিবাহেরই বা জোগাড় হয় কি করিয়া। একমাত্র, হইতে পারে যদি জলির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন, তবে। অগত্যাই তিনি সমস্ত সংস্কারের বাধা ঠেলিয়া পুত্রের কল্যাণের জন্য তাহাতেই সম্মত হইবেন ঠিক করিলেন। গণৎকারকে এই অমূল্য উপদেশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও কিঞ্চিৎ রৌপ্যমূল্য দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

—পাঁচ—

৯ই বৈশাখ। প্রভাতের বৈঠকখানায় আমাদের নিত্যকারের আড্ডা একটু সকাল-সকাল বসিয়াছে ; সে দিনটা একটা কিসের পর্ব্বদিন বলিয়া আমাদের সকলেরই ছুটি ছিল। রুদ্ধ হাসির বেগ অতি কষ্টে চাপিয়া হীরেন ঘরে ঢুকিয়াই গাম্ভীর্য্য হারাইয়া ফেলিল!

"কি হে হীরেন, বড় ফূর্ত্তি যে? হবেই ত, হবেই ত! আজ যে ফুল-শয্যা!"

হীরেন ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "আরে, সে জন্যে হাস্‌ছি বুঝি? সুধাকান্তের কাণ্ডটার কথা ভেবেই হাস্‌ছি। মা আমাকে রাজী হওয়ার কারণটা প্রকাশ ক'রে ব'লেই বল্‌লেন, 'কেমন, এবার জ্যোতিষীর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছিস্ ত?' আমি খুব গম্ভীর ভাবে "হ্যাঁ" বল্‌তেই তিনি বল্‌লেন, 'দেখ্‌লি, তোরা সব-তাতেই অবজ্ঞা আর হতশ্রদ্ধা দেখাস্!"

আমি আর থাকিতে না পারিয়া বলিলাম "হ্যাঁ, তুমি ত সন্তুষ্ট হয়েছ ; কিন্তু বাবা, ওরকম ভাবে যে একটা চাষাড়ে চড় মারবে, একথা ত আমাদের প্লানের কোথাও ছিল না।"

"হ্যাঁ, চড়টা একটু বে-আন্দাজীই হয়েছিল বটে ; কিন্তু কি ক'রবো ভাই, নইলে তুমি যে রকম হাসি-হাসি মুখ করছিলে, ভাবলুম বুঝি বা হেসে ফেলে সব মাটিই ক'রে দাও!"

"বেশ, বেশ, দু'দিন অফিস কামাই করালে; আমার গুণ্ডার মত চেহারাটা দেখে সাহেব ত অসুখ ক'রেছিল ব'লে বিশ্বাসই করতে চায় না। বিনা খরচায় এমন হাতের সুখ ক'রে নিলে। এমন কি

হেদোর ধারের যে গণৎকারটাকে পোষাক-ভাড়ার জন্যে পাঁচটা টাকা দেবার কথা ছিল সেটা শুদ্ধ নিজের পকেট থেকে দিতে হয়েছে। আমিই ত মাটি করলাম ?"

"আরে তা কি বল্‌ছি ? ওসব পুষিয়ে দেবো ভাই !"

* * * *

বৌ-ভাতেব সময় যখন "জলি"-বৌদিকে দেখিবার জন্য ঘাড় উঁচু করিয়া ভীড়ের মধ্যে উঁকি মারিলাম তখন বুঝিলাম যে হীরেন আমাদের যাহা যাহা বলিত তাহা সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হীরেনেব মায়ের অপছন্দের কারণটাও কিন্তু সেই সঙ্গে ধরিয়া ফেলিলাম ; কথাটা হীরেন আমাকে গোপন করিয়াছিল—'জলি'-বৌদি'র নাক্‌টি একটু খ্যাঁদা। তা খ্যাঁদা হউক, তাহাতেই যেন তাঁহাকে অধিকতর সুন্দরী মনে হইতেছিল !

———

'ফ'-এ 'এ'-কার 'ম'

যেদিন 'লেক্ রোডে' দুইটি মুসলমান গুণ্ডার হাত হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য একটি কলেজের মেয়েকে রক্ষা করিয়া সমগ্র ভদ্রসমাজের প্রশংসাভাজন হইলেন, সেই দিন হইতে আমাদের কুড়োনচন্দ্র মাইতি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল।

ছেলেবেলা হইতেই তাহার প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, একটা কিছু কীর্ত্তি অর্জ্জন না করিয়া মরা হইবে না। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে রস-সিঞ্চন করিতে করিতে কুড়োনচন্দ্র, জীবনের কুড়িটি বৎসর নির্ঝঞ্ঝাটে পার হইয়া আসিয়াছে। সে তাহার বন্ধু-বান্ধবের কাছে প্রায়ই দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিত—"বাঙ্গালীর জীবনটা ডাল ভাতের মতই নিতান্ত সাধারণ ও বৈচিত্র্যহীন। জীবনে একটা যে এ্যাড্ভেঞ্চার্ কি রোমান্সের সন্ধান মিল্‌বে, তার কোনো উপায়ই দেখ্‌ছিনে। জন্মাবামাত্রই পুতু-পুতু ক'রে মা-বাপে 'বাপ্‌টি-আমার ধনটি-আমার' করতে করতে, 'মানুষ' না ক'রে

'বাঙ্গালী' তৈরী কর্‌লেন। বিশ্ববিদ্যালয়, ছেলের ঘাড়ে ছেলের চেয়ে বেশী ওজনের যত সব অপাঠ্য 'পাঠ্যপুস্তকের' বোঝা চাপালেন। হষ্টেল্ আর কলেজের মধ্য-পথে কয়েকজোড়া জুতা ক্ষইয়ে যদি বা বৈচিত্র্যহীন ষ্টুডেণ্ট্ লাইফ্‌টা কাটানো গেল, ততঃ কিং? বি-এ পাশ করবার আগেই ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে ভেবে মাতাপিতা ছেলেকে 'বিয়ে'-তে পাশ করিয়ে রাখলেন্; পুত্রকন্যার মুখ-চুম্বন করতে করতে বাঙ্গালীর ছেলে যদিও বা কোনো গতিকে বি-এ পাশ ক'রে গ্র্যাজুয়েট্ হল, তারপর তার যা অবস্থা সে ত ঐ 'চৌরঙ্গীর' মতই প্রকাশ্য ও প্রশস্ত! কোথায় গেল স্কুলের মুখস্থ করা 'ফার্ষ্ট্ থিয়োরেম্' 'সেকেণ্ড্ থিয়োরেম্'? 'কস্-ট্যান্-থিটাই' বা কি কাজে লাগ্‌লো? শ্বশুর অথবা জ্যেঠ্‌শ্বশুরকে ধ'রে জামাইবাবু যদি ত্রিশটাকার একটি কেরাণীগিরী জোটাতে পারলেন, তা হ'লে তিনি আমাদের সমাজের ভাগ্যবান ফোর্ড অথবা রকৃফেলারের সমকক্ষ ব'লে গণ্য হয়ে পড়লেন! কেরাণী হয়ে পরের লক্ষটাকার হিসাব রেখে রেখে নিজের অনাহার-ক্লিষ্ট মস্তিষ্কটি খারাপ ক'রে যখন স'রে পড়বার তলব্ এল, তখন হয় ত বয়েসটা চল্লিশের কোঠাতেই রয়েছে। এ-জীবন আবার জীবন? না আছে 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার্' না আছে 'ফেম্'।"

এই 'ফেম্'-টা লইয়াই আমাদের গল্প। সে এত 'ফেম্' 'ফেম্' করিত যে আমরা তাহাকে 'ফ'-এ 'এ'-কার 'ম' বলিয়া রাগাইতাম। গল্পের গোড়াতেই যে ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা যখন কাগজে দিনের পর দিন সবিস্তার বাহির হইতে লাগিল তখন আমরা কুড়োনকে বলিলাম "ভায়া এই ত তোমার ফেম্ অর্জ্জন কর্‌বার সুযোগ উপস্থিত!" সে মুখ গম্ভীর করিয়া উত্তর দিল "নেহাৎ ঠাট্টা নয়; বাঙ্গালীর দুর্ণাম ঘুচে যায়, যদি "বিজয়কৃষ্ণ বাবুর" মত দু'চারটি যুবক প্রত্যেক কলেজেই পাওয়া যায়।"

তারপর কুড়োনচন্দ্রের যে রুটিন আরম্ভ হইল, আমরা তাহাকে কোনোমতে টিউশানির চেষ্টা বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। সকালে উঠিয়াই ছোলাগুড় খাইয়া সে রীতিমত ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া দিল। একখানা 'যুযুৎসু'-সম্বন্ধীয় বই নগদ দেড়টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া ফেলিল। একান্তে তাহাকে যখনই থাকিতে দেখিতাম তখনই মনে হইত সে কাল্পনিক শত্রুর সহিত প্রাণপণ লড়াই করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "যুযুৎসুর প্যাচগুলো অভ্যাস করছি।" পাছে ছায়ার সহিত লড়াই ছাড়িয়া সে কায়ার সহিত লড়িতে চায় এই জন্য আমরা সভয়ে তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে আরম্ভ করিলাম।

*　　　*　　　*　　　*

একদিন সদলবলে আমরা 'লেকের' ধারে বেড়াইতেছি; সন্ধ্যা হয়-হয়; এমন সময় বহুদূরে কুড়োনের মত একজন কাহাকে দেখিয়া আমরা থামিয়া গেলাম। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে আমাদের মনে হইল কুড়োনচন্দ্র যেন কিসের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, এবং শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে হিংস্র শ্বাপদকে যেরূপ ভঙ্গিতে দেখা যায় সেইরূপ ভঙ্গিতে ত্রিভূবন বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে আমাদেরও কৌতূহলের সীমা রহিল না। কুড়োনচন্দ্রের বেশ কয়েক গজ দূরে একটি তরুণী মহিলাকে একজন কৃষ্ণকায় কুশ্রী গোছের লোক, যতবার হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেছে তরুণীটি ততবার বিরক্তির সহিত তাহার হস্ত সরাইয়া দিতেছে। উত্তেজনায় আমরাও অস্থির হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় কুড়োনচন্দ্র শার্দ্দূল-বিক্রমে পুরুষটির উপর লাফাইয়া পড়িল। আমরা দূর হইতে ফলাফল লক্ষ্য করিতে লাগিলাম; কারণ

কুড়োনচন্দ্রের ব্যায়ামপুষ্ট দেহ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট উচ্চ ধারণাই ছিল। প্রথমটা কিছুক্ষণ 'বক্সিং' চলিল, কিন্তু তাহাতে সুবিধা করিতে না পারিয়া কুড়োনচন্দ্র যুযুৎসুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। একটার পর একটা সে যতই প্যাঁচ কষিয়া চলিতে থাকে, বিপক্ষীয় লোকটি তত্তই প্রত্যেকটাকে পাল্টা প্যাচে কাটাইতে লাগিল।

ততক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। দূরে দূরে যে কয়টা মিউনিসিপ্যালিটির আলো ছিল, সব কয়টাই জ্বলিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির অন্ধকারকে বিকটতর করিয়া যেন তাহারা প্রেতপুরীর প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে! যাঁহারা বায়ু-সেবনের জন্য বৈকালে আসিয়াছিলেন তাঁহারা অন্ধকার হইবার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন। সময়টা ঠিক সেই সময়, যখন বায়ুসেবীর দল আর থাকেন না এবং নিশীথ-বিহারীর দলও আসিবার উপযুক্ত রাত্রি হয় নাই বুঝিয়া আসে না। এই সন্ধিক্ষণে যে তরুণী ও কুশ্রী লোক্‌টির বর্ণনা ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, বিশেষে তাঁহাদের ব্যবহারের যে ধারা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাতে আমরা বুঝিলাম যে, যশোলক্ষ্মী এতদিন পরে কুড়োনচন্দ্রের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন!

অন্ধকার ক্রমশঃই এত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল এবং ব্যাপারটা আলোকিত স্থান হইতে এতই দূরে হইতেছিল যে আমরা সেই যুদ্ধের বালী ও সুগ্রীবকে কিছুতেই চিনিতে পারিতেছিলাম না। শেষে উত্থান-পতন, মধ্যে মধ্যে উচ্চভাষণ ও ঘন ঘন পটাপট্‌ শব্দে বুঝিতে পারিলাম যে "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" হইয়া গিয়াছে। তরুণীটি ততক্ষণ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে কোথায় অন্তর্হিতা হইয়াছেন। আমাদের মধ্যে

একজন বলিল, "চল, কুড়োনকে সাহায্য করি গে"। আর এক জন তাহার উত্তরে বলিল "তারপর দোষের ভাগী আমাদেরই হ'তে হবে। ফেম্-অর্জ্জনের এতবড় সুযোগটা তার যদি মাটি ক'রে দিই তবে কি আর সে আমাদের————" তাহার কথা অকস্মাৎ এক অভাবনীয় ব্যাপারে অসমাপ্ত রহিয়া গেল! কোথা হইতে ঝড়ের মত বেগে সেই তরুণী আমাদের সম্মুখে প্রায় পাগলের মত হইয়া আসিয়া বলিলেন "আপনারা দয়া ক'রে আমার স্বামীকে বাঁচান!"

"আপনার স্বামী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; শীগ্গির যান্; এক পাগলের পাল্লায় প'ড়ে তাঁর প্রাণটা বুঝি বেরোয়।"

"আপনার স্বামী, তবে আপনি অমন বিরক্তি প্রকাশ ক'র্‌ছিলেন যে?"

তরুণী লজ্জাবনত মুখে বলিলেন "আমাদের নতুন বিয়ে হয়েছে।" নিমেষে আমরা ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া সকলে দ্রুতপদে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। পৌঁছিয়া দেখি, কুড়োনচন্দ্র তাহার বিপক্ষের সবল বাহুদ্বয় ছাড়াইয়া ভূমিশয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা যাইতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল "এই রমেশ, খপর্‌দার্ বল্‌ছি ছাড়াস্ না—আমি এই পাষণ্ডটাকে একবার দেখে নেবো! তোরা স'রে যা' বল্‌ছি—!"

আমরা বলিলাম "আমরা ত স'রেই ছিলাম, কিন্তু তুমি কি কর্‌ছ জানো কি? এ ভদ্রলোক এঁর স্বামী।"

"এঁ্যা?"

'এর স্বামী।"

ততক্ষণ আমাদের উপস্থিতি ও স্ত্রীকে দেখিয়া ভদ্রলোক কুড়োনচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেও ধূলা ঝাড়িয়া ভদ্রলোককে নমস্কার করিল। এইরূপে কুড়োনচন্দ্রের ফেম্-অর্জ্জনের প্রথম অধ্যায়ের দুর্দ্দশাময় পরিণতি ঘটিল।

আমরা সেইদিন হইতে কুড়োনচন্দ্রের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। ছোলাগুড় ছাড়িয়া সে পুনরায় আমাদের মত চায়ের সঙ্গে কচুরী-সিঙ্গাড়া খাইতে লাগিল। যুযুৎসুর বইখানা বিলাইয়া দিয়া সকাল-সন্ধ্যা টিউশানির চেষ্টায় এখান-সেখান করিতে লাগিল। আমরাও বেচারার মুখের দিকে চাহিয়া করুণাপরবশ হইয়া তাহাকে 'ফ'-এ 'এ'-কার 'ম' বলা ছাড়িয়া দিলাম।

"সরল পল্লীজীবন" *

চাকরীটি বহুদিন কুইয়ে গ্রামে এসে বাসা গেড়েছি। গ্রামে সম্পত্তি আছে ব'লে নয়, শহরে আর থাকার জায়গা হ'লনা ব'লে। তিন কূলে কেউ নেই। সমস্ত ঘর দোয়ার আজ দশ বছরের অযত্নে ভূমি-সাৎ হয়ে গেছে, আস্‌শেওড়া ঘেঁটু, কুক্‌শিম্‌, আর নাম না জানা অনেক রকমের আগাছায় উঠোন আর একমাত্র যে ঘরখানা পড়ে নাই তার দাওয়াটা সমস্ত ভ'রে গেছে। তারই কতকগুলো হাতে ক'রে উপ্‌ড়ে একটা সরু পথ পরিষ্কার ক'রে আজ তিনদিন ঘরের যে কোন্‌টায় বৃষ্টি পড়েনা সেইখানে রাত্রে শুয়ে আর দিনের বেলায় মাঠের মাঝে, ক্ষেতের আলে, ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিলুম। তিন দিনের মধ্যে প্রথম দিনটায় একবেলা আহার জুটেছিল। প্রতিবেশী চৌধুরীরা এসে বল্লেন, ভাইত, অনেক দিনের পর! গ্রামে এলেনা, ঘর দোর দেখ্‌লেনা, সব পড়ে-হেজে গেল! তা এসেছ বেশ করেছ, এবার ঘর-দোর সারিয়ে, ২।১ খানা নতুন উঠিয়ে, বাড়ীটার চারদিকে পাঁচীর দিয়ে ভিটেটাকে একটু ভদ্রলোকের ভিটের মতন কর। বল্‌লুম্‌

---

* গল্পটি অন্ততঃ চার বৎসর পূর্ব্বের রচনা। এখনকার অস্পৃশ্যতা-সমস্যার শেষ কোথায় দেখিবার জন্য উন্মুখ আছি।—লেখক।

টাকা চাইত; উত্তরে বল্লেন টাকা. কত আর টাকা? টাকা নয় হে, মনের ইচ্ছের দরকার, একটু ইচ্ছে থাকলেই এসব হয়। টাকা চল্লিশেক খরচ করলেই পাঁচীরটা একরকম হ'য়ে যায়; আর যে ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে ওটা ছাইতে হ'লে টাকা পঞ্চাশ, আর একটা এখন অন্ততঃ চালা-ঘরের মতনও রান্নাঘর, টাকা কুড়ি হলেই হয়; উঠোন পরিষ্কার ইত্যাদিতে আর গোটা দশ ধর; এই সবশুদ্ধ একশো-কুড়ি-টাকা বইত নয়!

পেটে যখন একটা দানা দেবার পয়সা থাকে না তখন যে শুধু মনের একটু ইচ্ছে থাক্‌লেই একশো-কুড়ি-টাকা জোগাড় করাটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে এ সত্যটা আবিষ্কার ক'রতে পারি নাই ব'লে খুবই বেকুব বনে গেলুম। কি করি, অবস্থা যার খারাপ সে ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিন সহস্রবার বেকুব।

এক গাদা উত্তর ঠোঁটের আগায় ভীড় ক'রে জড়ো হ'য়েছিল। কিন্তু কার সঙ্গে তর্ক করব? যদি কারুসঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয় ত সে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে। চুপ ক'রে রইলুম। অনর্থক পৌরুষ প্রচার ক'রে কেবল পেটের জ্বালাটাই বাড়্‌বে বইত নয়? আর লোক চটিয়ে লাভ কি? বন্ধুত্ব না করুক শত্রুতাটা না ক'রে!

সে দিন সকালটা চৌধুরীরা নেমতন্ন করেছিল, বলেছিল, এসেই কোথায় আর খাবার জোগাড় করবে? একটু গুছিয়ে-পাতিয়ে নাও, খাওয়া দাওয়ার পর সাঁওতাল পাড়ায় গিয়ে জন-মুনিষ জোগাড় ক'রে উঠোনটা চাঁছাও, ঘরটায় খড় দাও। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পর যখন একটু গুছিয়ে-পাতিয়ে নেবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না; সাঁওতাল

পাড়ায় গিয়ে জন-মুনিষও জোগাড় ক'রে আনলুম না ; 'বাড়ুই'দের সঙ্গে খড়ের কাহন সম্বন্ধে সলা-পরামর্শও করলুম না, তখন আমার জন্যে চৌধুরীদের মাথাব্যথাটা একেবারেই ছেড়ে গেল।

রাত্রে 'নিশি-পালন' হল। সকালে নিমের ডাল ভেঙ্গে দাতন ক'রে প্রাতভ্রমণের জন্যে মাঠের মাঝে বেরিয়ে পড়লুম। ধানের সবুজ চারা দুলছে ; এক একবার সকাল বেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় এক একটা উচ্ছ্বাস ধানের চারার মাথায় ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সকালটা চমৎকার। কিন্তু সেইজন্যে আরও মুস্কিল। স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় ক্ষিদেটা পেটের মধ্যে 'জানান্' দিতে লাগ্লো। ধানের শীষের দু' একটা ছিঁড়ে কচি ধান টিপে দুধ খেতে খেতে খানিকটা চল্লুম। পকেটে পয়সা নাই ; আছে কেবল অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

ধানের দুধে প্রাতরাশ সেরে নিয়ে, লোক-বিরল পাড়া-গাঁয়ের গলিপথ ধ'রে সবাইকার চোখ এড়িয়ে টুপ ক'রে একসময় ঘরে ঢুকে পড়লুম। এর ওপর পৌনঃপুনিক ব্যবস্থায় পরের দিনটাও চল্লো।.........

বিকেলে গ্রামের একজন অর্থবান মজলিশী বৃদ্ধের জমায়েৎ বৈঠকখানায় গিয়েছিলুম. মজ্লিশ্ জমাবার মতন শরীর ও মন তখন নয়। একথা-সেকথার পর যখন আসল কথা পাড়বো ভাবছি তেমন সময় তিনি বললেন 'হয় সংসারী হও নয় সন্ন্যাসী হও বাবা—।' বল্লুম, সংসারী হ'তে নারাজ নই ; অর্থ-সামর্থ্যেরই যা' অভাব। তিনি বল্লেন 'আমার বয়স হ'ল গিয়ে পঁচাত্তর বৎসর ওসব কথায় কি আমরা ভুলি ? সামর্থ্য-টামর্থ্য সব বাজে কথা, একটু ইচ্ছে থাকলেই বিয়ে করা

যায়। নইলে খাটতে, রোজগার ক'রতে মন লাগ্‌বে কেন? কোনো কাজ করতে গেলেই মনে হবে কার জন্যে কর্‌ছি? অমনি বাহু শিথিল হয়ে আসবে। বিয়ে কর, বিয়ে কর।'

ইচ্ছের এমন অদ্ভুত একাধিপত্য দেখে খুবই বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলুম। হায় ইচ্ছে! ইচ্ছে করলেই টাকা, ইচ্ছে করলেই বিবাহ! টাকা কড়ি, অর্থ-সামর্থ্য সব বাজে, সব অসার; ইচ্ছা ইচ্ছা হি কেবলম্‌! পেটের মধ্যে দাবানল যাচ্ছেতাই রকম অভদ্রতা জুড়ে দিয়েছে, শুক্‌নো মুখে, নমস্কার ক'রে, উঠে পড়লুম।

পথে যেতে যেতে মনে পড়ল একজন গ্রাম্য ভদ্রলোকের কথা। তিনি এখন কলকাতায় বেশ রোজগার করেন, সেইখানেই বিবাহ করেছেন ও গ্রাম-মুখো হ'ন না। তিনি কথা-প্রসঙ্গে একদিন সন্ধ্যারাত্রে ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন। তখন আমিও কলকাতায় এবং সেইখানে উপস্থিত ছিলুম। তিনি বল্‌ছিলেন—সহরগুলো বাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। উপার্জ্জনের যে রকম বাজার, লোকজন যেরকম বেড়ে যাচ্ছে তা'তে অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা ছেড়ে সবাইকেই গ্রামে ফিরে যেতে হ'বে।

শেষ কথাটাই ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য। গ্রামে গেলে যে কত অল্পে চলে, তার একটা ফিরিস্তিও তিনি দাখিল কর্‌ছিলেন। বল্‌ছিলেন "বাড়ীর উঠোনে একটু পুনকো-পালং-এর ক্ষেত, দুটো লাউ-কুমড়োর গাছ, বিঘে-ছয়েক জমি, আর একটা "গাভী"—বাস্‌।

এই 'গাভী'টার এমন শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ তিনি করেছিলেন যে সেটা আজও যেন আমার কর্ণপটাহের উপর বিচরণ কর্‌ছে! আর মনে পড়লো তাঁর উত্তেজিত বক্তব্যের উপসংহার:—

"গ্রামে যাও, শান্তি পাবে; সরল লোকদের সঙ্গে মিশ্‌লে পর মনের সমস্ত ময়লা ধুয়ে যাবে; সহানুভূতি আর স্নেহের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে যাবে।"

সেই গ্রামে অবশেষে আজ ফিরে এসেছি!

পরম শুভাকাঙ্ক্ষীর মত যাঁরা বাড়ী মেরামৎ ক'রে বিবাহ করতে উপদেশ দিলেন তাঁরা কেউত খোঁজ নিলেন না যে আহার নামক নিতান্ত আধিভৌতিক ব্যাপারটা জঙ্গল-সমাকীর্ণ আচ্ছাদন-হীন দেওয়ালের মধ্যে কি ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে, বা হচ্ছে কি না? ও ভাবনা ত তাঁদের করার কথা নয়। সরল গ্রাম্য ব্যক্তি, বেশী কথায় থাকেন না, স্নেহ-সহানুভূতিতে ভরা ব'লেই না আমার মত উড়োন-চণ্ডীকে দু' দুটো দামী উপদেশ দিয়ে ফেল্‌লেন? তার ওপর ওঁদের যে শাকের ক্ষেত এবং একটা 'গাভী' আছে!

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আকাশে ঘোর কালো মেঘ; যেটুকু আলোও বা থাক্‌তো সেটুকু ঢাকা গেছে। দিনের বেলায় সমস্ত দিনটাই টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়েছে, পথের মাঝে সর্ব্বত্র কাদা; এক এক জায়গায় জল জ'মে বেশ পিছল হ'য়েছে; ঘাসে, বনে, আগাছায়, সারা পথটা গ্রামের আর আর পথগুলোর মতই ভৌতিক ভীষণতায় এঁকে বেঁকে অন্ধকারে মিশে গেছে। সন্তর্পণে পা ফেলে, অন্ধকারে চোখ দুটোকে যতটা সম্ভব বিস্ফারিত ক'রে চলেছি। দুধারে ঝোঁপে-ঝাড়ে ঝিঁ-ঝিঁ পোকাগুলো অবিশ্রান্ত ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ শব্দের ঐক্যতানে অন্ধকারের ভীষণতাকে আরও বাড়িয়ে তুল্‌ছে। জোনাকী পোকা দপ্ দপ্ ক'রে গাছের ভিজে পাতায় পাতায় জ্ব'লে নিভে

উঠ্ছে! কতকগুলো এপাশে ওপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশে থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকজন কেউ বাইরে নেই বলেই মনে হচ্ছিল; চলেছি,—মাথাটা ক্ষিদের জ্বালায় ঘুর্‌ছে, ঝিম্ ঝিম্ করছে, মনটা উগ্র ও বিশ্রী হয়ে রয়েছে।.........

"উ-হু! বাবা গো!"

শব্দ লক্ষ্য ক'রে ছুটে গিয়ে দেখি বাগ্দীদের একটা ছেলে কাদায় প'ড়ে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে।

"কিরে, কি হয়েছে?"

"সাপে কেটেছে গো—উঃ!"

"কোথায় কোথায়?"

ছেলেটা তার পায়ের 'গোছ' দেখিয়ে দিলে। পেটে ভাত ছিলনা কিন্তু পরণে কাপড় ছিল। খানিকটা ছিঁড়ে একটা কালির মত বের ক'রে ছেলেটার পায়ের দু'তিন জায়গায় খুব ক'ষে বেধে দিলুম। তারপর তাকে কাঁধে ক'রে ছুট্‌লুম ডাক্তারের কাছে।.........

ডাক্তার বল্‌তে গ্রামের মধ্যে সেই 'একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি'। মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে একবছর পেছনের বেঞ্চিতে বসেছিলেন। তারপর অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে একজন ডাক্তারের কাছে মাস ছয়েক কম্পাউণ্ডারী ক'রেই পূরোদস্তর চিকিৎসক হ'য়ে উঠ্‌লেন। এঁর এখন বেশ পসার ও প্রতিপত্তি। আশ-পাশের তিন চারখানা গ্রাম থেকে ডাক আসে। এঁর ডাক্তারখানায় অনেক ওষুধ থাকে; যথা ক্যাষ্টর অয়েল, কুইনিন, রোজ-সিরাপ, দুটি বাল্‌তী খিড়কীর পুকুরের জল!

সোয়ামিন ও কুইনিন্ ইঞ্জেক্‌শান্ প্রভৃতি নিয়ে এই ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট দেশে ইনি দ্বিতীয় শুক্রাচার্য্য সেজে বসে আছেন।

ডাক্তার-বাবু বেরিয়ে এসে খানিকটা 'পার্‌মাঙ্গনেট্ অব্ পটাশ্' রক্তপড়ার মুখে টিপে ধ'রে রইলেন।

আমি ছুট্‌লুম ছেলেটার মা-বাপকে খবর দিতে। একে অন্ধকার পিছল পথ, তায় শরীর অনাহারে দুর্ব্বল, পা-ও এরকম পথে চল্‌তে অভ্যস্ত নয়; দু' একবার পড়্‌তে পড়্‌তে সাম্‌লে নিয়ে পৌঁছলুম। অধর জাতে বাগ্দী হ'লেও কথাবার্ত্তায় ভারী ভদ্র। পরে জেনেছিলুম, স্বার্থান্ধ সমাজ যা'কে হেয়-জাতির অন্তর্ভুক্ত ক'রে রেখেছে সে হৃদয়ের, মনুষ্যত্বের দিক থেকে হেয় নয়, সমাজের শ্রেষ্ঠদের চেয়ে বরং অনেকাংশে বেশী মহৎ।

অধর এসেই ছেলেকে বুকে ক'রে নিলে। অল্পক্ষণ পরেই বোঝা গেল যে 'নব্‌নে' বা নবীন সে যাত্রা বেঁচে গেছে।

*　　*　　*　　*　　*

পরদিন ভোরে দেখি অধর আমারি বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কিরে অধর?'

'বাবু!'

লোকটার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক বিস্ময় ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌লো। তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখলুম সে আমার ভিজে কাদামাখা কাপড় জামার দিকে চেয়ে আছে। আমার দ্বিতীয় পরিচ্ছদ ছিলনা যে সেগুলো বদ্‌লাই; সেই প'রেই ঘুমিয়েছি; শরীরটাতেও জ্বরভাব এসেছে।

বল্‌লুম "ও কিছু নয়, অন্ধকারে তোর বাড়ী যেতে যেতে দু' একবার পা পিছ্‌লে প'ড়ে গিয়েছিলুম। আয় না উঠে আয়।"

লোকটা সঙ্কোচে উঠ্‌ছিল না, নইলে বেশ বুঝতে পারলুম, তা'র ঘরের দাওয়ায় উঠে আসার খুব ইচ্ছে আছে।

"আয় না।"

"যাবো বাবু?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ও সব মানিনে। বেড়ালটা ঐ দেখ্‌ উঠে এসে একপাশে ঘুমুচ্ছে, আর তুই উঠ্‌বি তা'র হয়েছে কি?"

"বাবু, আমরা যে বাগ্দী!"

"না তোরা মানুষ!"

কিছু বুঝতে না পেরে সে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু যখন তাকে আবার হাতের ইঙ্গিতে আস্‌তে বল্‌লুম সে ধীরে ধীরে দাওয়ায় উঠে এল।

ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে অধর বল্‌লে বাবু, একি?"

"কেন রে?"

"ঘর যে জলে জলময়।"

"তা আর কি করি বল্‌? এগারো বছর নেরামৎ নাই; চালে খালি বাখারী ঝুল্‌ছে, রাত্রে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে।"

"হ্যাঁ বাবু, তা ঐ কাদায় শুয়ে আছ? কেন তোমাদের জ্ঞাতি-কুটুম কোনো ভদ্দর নোকের বাড়ীতে শুতে যাউনি কেনে?"

"জ্ঞাতি-কুটুম আমার আবার কে আছে বল্‌? ছেলেবেলা থেকে নিজের অন্নের জোগাড় নিজে ক'রে আসছি, কেউ একমুঠো খেতে

দেয়নি ; আত্মীয়-কুটুম যা'র থাকে তার কি সে দশা হয় ? সমাজের পাতানো সম্পর্কের কোনো দাম নেইরে অধর, মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে সেইটেই বড়।" বেশ বুঝ্‌লুম অধর আমার কথার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছে না। পারবে কি ক'রে ? পুরুষানুক্রমে যাদিকে আমরা বুঝ্‌তে দিইনি, শিখ্‌তে দিইনি, জান্‌তে দিইনি, সে আজ অত যুগের বংশ পরম্পরার সংস্কার অতিক্রম ক'রে বুঝতে পারে কি ক'রে ? সে জানে সে বাগ্দী ; সে যে মানুষ, এ কথা বল্‌লে সে হাঁ ক'রে থাকে।"

বল্‌লুম "তাদের বাড়ীতে শুতে যাব কি রে, আজ দু'দিন যে পেটে একটা দানা পড়েনি তা'র খোঁজ কি তারা নিয়েছে ?"

"এঁ্যা বল কি বাবু ? আজ দু'দিন খাওনি ?" লোকটা যেন চম্‌কে উঠ্‌লো।

"ওকি রে অধর ? তুই কাঁদ্‌ছিস না কি ?"

চোখ মুছতে মুছতে অধর দাওয়া থেকে নেমে চ'লে গেল ; চ'লে যেতে যেতে ধরা গলায় ব'লে গেল, "কোথাও বেরিওনি বাবু, আমি এখুনি আস্‌ছি।"

বৃষ্টিটা ছেড়েছে। আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে, বোধ হয় কিছুক্ষণ এমনি থাক্‌লে রোদও উঠ্‌বে ; সকাল সাড়ে ছ'টা আন্দাজ হবে।

জামাটা একটা বাখারীর ওপর ঝুলিয়ে দিলুম। কাপড়ের কোঁচার দিকটা মেলে রইলুম। ফেরাফিরি ক'রে যতটা শুকোয়।

অধর চ'লে যাবার একটু পরেই চাটুয্যে মশায় একটা পেতলের সাজি হাতে, এখানে একটা, ওখানে একটা, লম্বা লম্বা পা

ফেলে, সম্ভবতঃ কাদা এড়িয়ে একবার এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে আমার উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। গায়ে নামাবলী, পরণে পট্টবস্ত্র, টিকিতে বেলপাতা ; পূজোর জন্যে ফুল তুল্‌তে বেরিয়েছেন। সাত্ত্বিক আয়োজন দেখে সম্ভ্রম-ভরেই একটা নমস্কার করলুম। মাথাটা খাড়া ক'রে, নাক কুঁচ্‌কে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লেন, "রাজেন, তোমার দাওয়াতে অধ্‌রা বাগ্দীকে দেখেছিলুম না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ও এসেছিল।"

"বাগ্দীকে ঘরে উঠ্‌তে দিয়ে ভাল করনি। ছোট জাতের আস্পর্দ্ধা যে ওতে অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। সকালে উঠে ওদের মুখ দেখলেই পাপ, তার ওপর না হয় উঠোনেই দাঁড়াক, তা নয় একেবারে ঘরে ? তোমার ঠাকুর দা' অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন হে !"

সকাল বেলায় বাসি মুখে খালি পেটে কারুরই তক করবার প্রবৃত্তি থাকে না, আমারো বড় একটা ছিলনা, সংক্ষেপে বল্‌লুম "আমার ঘর আর উঠোনে আর তফাৎ কই চাটুজ্যে মশাই ?"

চাটুজ্যে মশাই আমার ভঙ্গিতেই বোধ হয় তাঁর কথার উত্তর পেয়ে গেলেন, বল্‌লেন—

"নেহাৎ অনাচারটা দেখতে পারলুম না বলেই বল্‌তে আসা, নইলে তোমার ব্যাপার তুমি যা-ইচ্ছে কর ; তবে এটাও বলে রাখিহে, যতই লেখাপড়া শেখো আর টাকার জোর, রক্তের জোর থাক সমাজের কর্ত্তা এখনো তোমরা হ'তে পারোনি, সে ঘাঁটি আজও আগ্‌লে আছি আমরা। এই ব'লে গেলুম, প্রায়শ্চিত্ত না করলে আমরা কারো খাতির রাখবোনা ; একঘ'রে হয়ে থাক্‌তে চাও ত যা খুসী কর।"

তর্জ্জনীটাকে অকারণে আস্ফালিত করতে করতে আবার ডিঙ্গি মেরে মেরে চাটুজ্যে মশায়ের ত্বরিত প্রস্থান হ'ল। পাঁচীরের ওপারে যখন তাঁর টিকি, এবং টিকির বেলপাতা অদৃশ্য হ'য়ে গেল তখন আমার মনটাও যেন আবার হাল্কা, পবিত্র হয়ে উঠ্‌ল। আচ্ছা, মনের মধ্যে এই রকম একরাশ তর্ক, দ্বন্দ্ব, দ্বেষ আর অসাত্ত্বিক মনোভাব নিয়ে এরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব'লে গর্ব্ব করে কি ক'রে? সকালটাকে অধর বাগ্দী ব্যর্থ করে থাকুক বা না থাকুক ইনি যে সেটাকে বিশ্রী ক'রে দিয়ে গেলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না।

অধর ফিরে এলো। তার এক হাতে একটা বড় কাঁসার 'জামবাটি' আর এক হাতে একটা গামছার পুঁটুলী। সে দাওয়ায় উঠে এসে সেগুলো সব আমার সুমুখে খুলে ধরলে। জাম-বাটিতে ফেনা শুদ্ধো সদ্য-দোহা একবাটি দুধ। গামছায় চিঁড়ে, ধবধবে পরিষ্কার সরু ধানের; চারটে বড় বড় মর্ত্তমান কলা আর একটা ছোট বাটিতে শালের টাট্‌কা 'এখো গুড়'। অধর বিনীত কাতর অনুরোধ ক'রে সেগুলি আমায় খেতে বল্‌লে। কত সঙ্কোচ, কত সংশয়! সংশয় এই, যদি আমি 'খাবোনা' বলি। সত্যি আমি যদি একটিবার 'না' উচ্চারণ করতাম তা' হ'লে অধরের মুখখানা যে কি রকম হ'য়ে যেতো তা আমি তা'র অনুরোধের সনির্ব্বন্ধতায় অনুমাণ করতে পার-ছিলুম। তারপর সে কত কৈফিয়ৎ,—মাজা, ধোয়া জামবাটিতে এক ফোঁটা জল লেগে ছিল না, স্নান ক'রে কাচা কাপড়ে সে নিজে হাতে গরু দুয়েছে; অনেক বামুন-কায়েতের বাড়ীতে ত দুলে-বাগ্দীরা দুধের রোজ দেয়; চিঁড়ে ফল আর গুড়ে ত কোনো দোষই নাই, অপরাধ হবে ব'লে সেটা আর গরম ক'রে দিতে পারে নাই—তবে

শুক্‌নো কাঠ, কেরোসিন, উনানের জন্য ইট, সে সবই এখুনি জোগাড় করে' দিচ্ছে......ইত্যাদি।

আমার চোখের কোল জলে ভ'রে উঠ্‌লো। অধরের এই একরাশ কৈফিয়তে আমার মন উত্তরোত্তর আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছিল। অধরকে বাগ্দী ক'রে পৃথিবীতে কে পাঠিয়েছে ?—ভগবান ? আমাকে তার চেয়ে উঁচু জাত ব'লে কে স্বীকার করে ?—ভগবান ?

বাগ্দী, বামুন, উঁচুজাত-নীচুজাত মানুষের সৃষ্টি, ভগবানের নয়। মানুষেই মানুষের এ কী শত্রুতা ক'রেছে। কই আজ আমার উঁচু স্বজাতীয় আত্মীয়েরা ? কেউত তাঁদের মধ্যে উঁকি দিলেন না ; সমাজ-দলিত, সমাজে পতিত এই নীচ জাতীয় অধরই ত আজ আমায় উপবাসী দেখে তার যথাসাধ্য আমায় দেবার জন্যে নিয়ে এল। তারপর অপরাধীর মত তাকে আবার কত কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। আর একটু আগে সমাজ-সম্রাট একজন ব্রাহ্মণ এসে নিরাশ্রয়, অর্থহীন, বুভুক্ষুকে সমাজ-চ্যুতির ভয় দেখিয়ে গেলেন ! হায় সমাজ !

কেউ হয় ত ভাব্‌বে অধরের ছেলেকে ডাক্তারের বাড়ীতে এনে বাঁচিয়েছিলুম বলেই সে এতটা করছে। কতকটা বটে, কিন্তু সবটা নয়। সেইজন্য সে হয়ত সকালে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে এসেছিল। তারপর স্বচক্ষে আমার অবস্থা দেখে তার যেখানটায় ব্যথা লাগ্‌লো, বামুন-বাগ্দী, ইতর-ভদ্রের বিচার ক'রে ভগবান সেই হৃদয়টারও শ্রেণী বিভাগ ক'রে দেন নি। ভট্‌চায্‌ মশাইয়ের ছোট ছেলেটাকেও ত জলে-ডোবা থেকে বাঁচিয়েছিলুম ; কিন্তু সেজন্য তিনি ছেলেটাকে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নিয়েছিলেন ! দিনের বেলাটা ত কোনো মতে চ'লে গেল। রাত্রে অধর বল্‌লে,

'বাবু এমন ক'রে ক'দিন চালাবে ?'

বল্‌লুম 'চালাবার মালিক কি আমি রে অধর ?'

তাকে বল্‌লুম যে তার সঙ্গে সে আমায় জমিতে ধান-রোয়া, বাগানে গাছ আগ্‌লানো, খালে মাছ-ধরা এমনি সব কাজে সঙ্গী ক'রে নিক।

ঘাড় নেড়ে সে বল্‌লে 'তা হয় না বাবু'—আমার এই রকমের কথায় সে বোধ হয় একটু হেসে-ও ছিল। তা'কে অনেক ক'রে বোঝালুম যে খেয়ালের ঝোঁকে ছেলেমানুষী ক'রে আমি তাকে একথা বল্‌ছি না; আমার এ মনের কথা। যা'র খাবার জোগাড় নাই তার আবার এ কাজ ও কাজ কি ? সে যা পাবে তাই করবে। যতদিন না আর কিছু জুটছে ততদিন মানুষের মত যেমন ভাবে হোক রোজগার ক'রে খাবে। লোক ঠকিয়ে জোচ্চুরি ক'রে খাওয়ার চেয়ে ত মাটিখুঁড়ে, গাছ পুঁতে খাওয়া ভাল ?

অধর বল্‌লে "না বাবু তুমি এ গাঁ'কে জানো না; এখানে তোমায় টিক্‌তে দেবে না; টাকার বল, লোকের বল, তোমার নাই, তোমায় ওরা সহজেই বিপদে ফেল্‌বে। তার চেয়ে তুমি লেখা-পড়া জানো, বড় ঘরের ছেলে, কল্‌কেতা যাও সেখানে চেষ্টা কর্‌লে তোমার কত উন্নতি হবে।"

"কলকাতাতেই ত ছিলাম রে অধর; সেখানের লোকেরা যে বলে, খেতে পাওনা, দেশে যাও। দেশে খরচ অল্প; লোকজন সব পরের উপকার করে, তা'রা তোমায় সাহায্য করবে।"

"জানিনা বাবু সে কোন গাঁয়ের কথা; কিন্তু এখানে ত এই জন্ম অব্‌দি রয়েছি;—টাকা না থাক্‌লে যে কি ক'রে খেতে

পাওয়া যায় জানি না ; আর পরের উপকার ? তা হ্যাঁ করে বটে, ঐ মুখুজ্যেরা করে মিত্তিরদের ; মিত্তির মশাইয়ের অনেক টাকা আর মুখুজ্যেদের পৈতে গাছটাই আছে, ট্যাঁকে কাণা কড়ি নাই। আর এই আমরা উপকার করি জমিদার মশাইয়ের। নিঃস্বার্থ উপকার ; কখনো একটা পয়সা পাই না মজুরীর। কিন্তু তবু উপকার করি, গতর দিয়ে, প্রাণ দিয়ে,—নইলে পিঠের চামড়া আর ঘরের খোড়ো চাল, দুটোই উড়িয়ে দেবে।"

অধর আমায় অনেক ক'রে বুঝুলে ; আমিও দেখলুম সত্যি, গ্রামে থাক্‌বো কার বলে ? অর্থহীনের বন্ধু নাই, গ্রামে এসে তিন দিনের মধ্যেই তিন শ' লোকের বিষ-দৃষ্টিতে পড়েছি। যাই সহরেই ফিরি ; টাকা, ক্ষমতা সঞ্চয় ক'রে কখনো পারি ত গ্রামে ফিরবো। তখন এই বাগ্দী-দুলের ঘরেই এসে উঠ্‌বো ; তাদের বিপদ হবে আমার বিপদ, তাদের অসুখ হবে আমার অসুখ ; তাদের বিশ্বাস, তাদের সাহায্য নিয়েই তা'দিকে মনুষ্যত্বের দাবী ফিরিয়ে দেবো। অধর আমায় তা'র কষ্টার্জ্জিত অর্থের কিছু ভাগ দিলে ; সেই হ'ল আমার পাথেয়।

বাঘ-নাচ *

(একটি প্রাচীন উৎসবের পরিচয়)

দেশকে জানিতে, বুঝিতে ও ভালবাসিতে হইলে প্রথমেই কৃত্রিমতা-বিবর্জ্জিত দেশের অন্তঃস্থল গ্রামগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইবে। সে পরিচয় যে দিক দিয়া যতটুকু হয়, ততটুকুই ভাল, ততটুকুই লাভ। তাহার পূর্ব্বেতিহাস, তাহার বর্ত্তমান অবস্থার বিবরণ, তাহার ছড়া, গল্প, বাউল-গান, অথবা অন্য কোনো প্রকার আনন্দোৎসবের পরিচয়,—যাহাই পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করিবে। সহরগুলি আজকাল প্রায় একই রকম হইয়া উঠিতেছে। কারণ, তাহাদের আদর্শ এক। কিন্তু বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার গ্রামগুলি আজও কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য লইয়া টিকিয়া আছে। বিভিন্ন জেলার বিভিন্নরূপ আনন্দোৎসব, রীতি-নীতি, সমাজ-সংস্কার ও পূজা-পদ্ধতি আজও গ্রামসমূহের বৈশিষ্ট্যরক্ষার সহায় হইয়াছে। আমি ইহারই একটা পরিচয় আজ দিতে বসিয়াছি।

---

* এটি গল্প পুস্তকের অন্তর্গত হইলেও নিছক গল্প নয়। তবে ইহা গল্পের মতই উপভোগ্য বলিয়া এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। —লেখক।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভৈটা গ্রামে এই 'বাঘ-নাচ' উৎসবটি বৎসরে একবার, শারদীয়া দুর্গাপূজার নবমীর রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার প্রথম প্রবর্ত্তনের তারিখ সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখিলাম যে, গ্রামস্থ প্রবীণরাও বলিতেছেন, তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের আমল হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে; কখন ইহা প্রথম প্রচলিত হয় অথবা কে যে ইহার প্রবর্ত্তক, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। তবে অনুমান করিয়া যতদূর বলা যায়, দেড়শত বৎসরেরও অধিককাল হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালার অন্য কোথাও হওয়া দূরে থাকুক, বর্দ্ধমান জেলারই অন্য কোনো গ্রামে এই 'বাঘ-নাচ' হয় না; সুতরাং ইহা ভৈটা গ্রামের নিজস্ব জিনিষ।

এই নৃত্যাভিনয়ের কুশীলব এইপ্রকার ঃ—

১। বেদে—(ব্যাঘ্র-শিকারী ও যে বাঘ নাচায়)

২। মোড়ল।

৩। ওঝা (গ্রাম্য কবিরাজ ও মন্ত্র-তন্ত্রের অধিকারী)

৪। চৌকীদার।

৫। বেদের স্ত্রী (ওরফে 'হিমির মা')

৬। ব্যাঘ্রদ্বয়।

ইহা ব্যতীত ঢাকী, ঢুলী প্রভৃতি বাজনদার থাকে।

যে 'বেদে' সাজে, তাহার হাতে একটা তীর-ধনুক, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের ওপর কাপড়ের পাগড়ী বাঁধা, মালকোঁচা-আঁটা কাপড়, গায়ে বিশেষ কোনো আবরণ থাকে না।

'মোড়ল' মহাশয়ের পোষাক যেমন-তেমন সাধারণ

গোছের হইয়া থাকে ; কারণ, গ্রাম্য-মোড়লের যা' office, তাহাতে তাঁহার আটপৌরে পোষাকই office dress।

'ওঝা' এক জন দীর্ঘ-শ্বেত-গুম্ফ-শ্মশ্রুবিমণ্ডিত ওস্তাদ ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, এই 'শ্বেত-গুম্ফ-শ্মশ্রু' অতি অল্পমূল্যে যাত্রার পোষাকের দোকান হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু হইলে কি হয়, বাঘনাচের আসরে এই ওঝার অভিনয় দেখিলে, রসগ্রাহী দর্শক যে তৃপ্ত ও মুগ্ধ না হইয়া পারিবেন না, তাহা আজও বলিতে সাহস হয়। না জানি পূর্ব্বে, যখন এ অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত, তখন ইহা কত হৃদয়গ্রাহী ছিল! এই ওঝা যখন মৃতকল্প বেদের পায়ের গোড়ালী টিপিয়া নাড়ী নির্দ্ধারণ করে ও কথায় কথায় দাড়িতে হাত দিয়া বলে, "হুঁ হুঁ বাবা, একি যে সে রোঝা ? কামরূপ থেকে এসেছি—দাড়ি-চুল সব সাদা হয়ে গেছে !" অথবা যখন সুরের মধ্যে একটা মন্ত্রত্বের আমেজ আনিবার চেষ্টা করিয়া বলে,—

"এই, আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের পা—
আর শালার বাঘ চল্‌তে পারবে না !"

এবং কটিতটে হস্তার্পণ করিয়া একটা অ-পুরুষজনোচিত নিতম্ব-ভঙ্গী সহকারে নিজের মন্ত্রের শক্তিতে নিজেই মোহিত হইয়া দাঁড়ায়—তখন তাহার অভিনয়-নিপুণতায় অতিবড় পেচকাননও দন্ত বিকশিত করিতে বাধ্য হয়।

'চৌকীদার' সাজে একটা যেমন তেমন লোক। এমন কি, এবার একটা লম্বা-গোছের বালককে ধরিয়া তাহার মুখে আলকাতরা দিয়া কৃষ্ণবর্ণ গুম্ফ ও গালপাট্টা রচনান্তর তাহার দ্বারাই অভিনয় করানো হইয়াছিল। তাহার হাতে একটা লম্বা লাঠি থাকে।

সাধারণতঃ একটি বালকই বেদের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে। বালক হইলেও তাহার দায়িত্ব বড় কম নহে, কারণ, তাহার ও ওঝার অভিনয়ের উপরই সমস্ত পালার সাফল্য নির্ভর করে—এই দুই জনের কথোপকথন ও অঙ্গভঙ্গির মধ্যেই যা কিছু হাস্যরস ও কৌতুক।

বাকী রহিল ব্যাঘ্র। ইহারা যখন এক একখানি কালো কম্বলের অন্তরালে সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বাঙ্গ গোপন করিয়া, মুখে প্রকাণ্ড মাটির মুখোস পরিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া সেই প্রসিদ্ধ চতুষ্পদের অনুরূপ অভিনয় করে, তখন কোলের ছেলে মাকে আরও জোরে আঁকড়াইয়া ধরে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দিকে ফিরিয়া যখন ইহারা বিকট হুঙ্কার সহকারে ছুটিয়া যায়, তখন তাহারা চলিত ভাষার সঙ্গে সম্বোধন-সূচক অব্যয় যোগ করিয়া মাতাপিতাকে স্মরণপূর্ব্বক দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় বিপরীত গতি গ্রহণ করে। রাত্রির অন্ধকারে সত্যই ইহাদের দাপাদাপি, পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিকট আজিও ভয়ঙ্কর ঠেকিয়া থাকে!

যাহা হউক, এইবার এই বাঘনাচটি তাহারা আদ্যোপান্ত যেরূপ অভিনয় করিয়া থাকে, তাহার বর্ণনা করি।

নবমীপূজার রাত্রি। দুর্গাপ্রতিমা উজ্জ্বল আলোকে হাস্য করিতেছে। ঠাকুর-দালানে ও দালানের নীচের উঠানে ভৈটা ও আশপাশের অন্যান্য ২।১টা গ্রামের যত ছেলে, মেয়ে, যুবা, বৃদ্ধ, বয়স্কা ও তরুণীর দল ভীড় করিয়া 'বাঘনাচ' দেখিবার জন্য আগ্রহোন্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান! বাঘ দুইটি থাপুস্ থুপুস্ করিয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া প্রথমেই গোটাদুই হুঙ্কার ছাড়িল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা

অমনই ছুটিয়া দূরে অথবা মাতাপিতার নিকট আশ্রয় লইল। বাঘ দুইটি মাথা নাড়িয়া, হুম্-ইয়াহুম্ করিয়া আরও খানিকটা জায়গা করিয়া লইল ; বাঘের পিছু পিছু বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচিতে ব্যাধ আসিল—হস্তে ধনুক-তীর। সে পূজার দালানের সম্মুখে বাঘ নাচাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এ দিকে গ্রামের চৌকীদার যথারীতি তাহার রাত্রির টহলে বহির্গত হইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল, পূজার বাড়ীতে অসম্ভব ভীড় (বলা বাহুল্য, এই চৌকীদার আমাদের বাঘনাচেরই জনৈক অভিনেতা)। সে অমনই মোড়লবাড়ী ছুটিল—

চৌকীদার। মোড়ল মশাই ! ও মোড়ল মশাই !

মোড়ল মশাই। কে রে এত রাত্রে ?

চৌকীদার। আজ্ঞে আমি গো, বিপিন চৌকীদার। একবার বেইরে(১) এসো না আপনি।

মো। (বহির্গত হইয়া) কেন রে, কি হয়েছে ?

চৌ। আজ্ঞে, এই কোথা হতে একটা বেদে না কে এসেছে গো মোড়ল মশাই ; সে এসে এক দালান লোকের ছামুতে (২) দুটো বাবা (৩) নাচাচ্ছে গো ! তুমি গিয়ে মানা কর্‌বে চলুন, ছেলে-মেয়েগুলোকে নইলে বাবায় খেয়ে ফেলবে।

---

(১) বেইরে—বেরিয়ে।

(২) ছামুতে—সম্মুখে।

(৩) বাবা—বাঘা, ব্যাঘ্র। ইহারা 'বাঘ'কে সময়ে সময়ে 'বাবা' বলে, আবার সময়ে সময়ে বাঘও বলে।

মো। চল্ চল্।

[বেদের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিবার উপক্রম করিতেই ব্যাঘ্রদ্বয় বিকট চীৎকার সহকারে মোড়ল মহাশয়ের কাছে লাফাইয়া পড়িবে]

মো। ছেই, ছেই, (১)—ওরে বাবা! আমাকেই খেয়ে ফেল্লে রে! ওরে ও ছোঁড়া, বলি তোর বাড়ী কোথা?

বেদে। বাড়ী? আজ্ঞে অনেক দূর!

মো। অনেক দূর, সে কোথা?

বে। এই আজ্ঞে, ঝাঝ্রা—ঝুঝ্রো, গো-গাঁ-গল্সী, তিলে-বেদে উপর-ডি, কেঁথা-ছেড়া বলরামপুর!

মো। বেশ, বেশ, সে বড় মন্দ নয়। তা এ কি করছিস্? পূজোর বাজার, ছেলেপিলে ধ'রে নেবে, বাঘ দুটোকে মেরে ফ্যাল্।

বে। 'বাবা' মারলে আমার চলবে না গো, ও হচ্ছে আমার ভাত-ভিক্ষে—বাঘ মারলে খাবো কি?

মো। খাবি ভাত, মুড়ি! বাঘ মারলে বাবুরা এমন ইলেম (২) দেবে যে, তোকে আর বাঘ নাচিয়ে খেতে হবে না।

বে। কি ইলেম দেবে?

মো। টাকা ভাঙিয়ে সিকি দেবে।

---

(১) ছেই, ছেই—বাঘ তাড়াইবার শব্দ। গরু তাড়াইবার যেমন 'হেট্ হেট্।'

(২) ইলেম—বক্শিস্, পুরস্কার।

মাঝে-ছেঁড়া মুড়ো (১) দেবে।
নাকে একটি মল দেবে।
পায়ে একটি নথ দেবে।
কাঁকালে একটা গাড়ীর হাল দেবে।

আর দেরী করিস্ নে, শীগ্রি মেরে ফ্যাল্।

বে। তবে আপনি দাঁড়াও, একবার সঙ্গে যে আছে, তাকে ডাকি।

মো। তোর আবার সঙ্গে কে আছে?

বে। আছে গো; সেই সে!

মো। সে, কে রে?

বে। সেই-য সে গো! সে ত তোমাদেরও আছে, সেই যে ভাত বেড়ে দেয়!

মো। ওঃ বুঝেছি—তা নে, তাকে ডাক।

বে। এই ত গেরো (২)! তাই ত এতক্ষণ বলি নাই! আবার আপনি তাকে নেবে না ত?

মো। যাঃ বেটা পাজী! তুই ডাক্ ডাক্—বাঘ মারতেই হবে।

(নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া)

বেদে। ও—হিমির মা! হিমির মা—রে! ওরে হিমির মা!—

---

(১) মুড়ো—গোটা কাপড়কে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা করিলে, এক এক টুক্‌রাকে 'মুড়ো' বলে।

(২) গেরো—গ্রহ, বিপদ।

(হিমির মা আসরে অবতীর্ণা হইতে হইতে)

হি-মা। কেন রে—'র বেটা! *

বে। ইদিকে আয়, ইদিকে আয়!

হি-মা। তবে কি বল্?

বে। বাবুরা বল্‌ছে যে বাঘ মার্‌তে হবে।

হি-মা। সেই কালেই ত বলেছিলুম, বাবা নিয়ে আসিস না!

বে। তা বাবুরা বল্‌ছে যে, আর আমাদের বাঘ নাচিয়ে খেতে হবে না; এমন ইলেম্ দেবে যে ব'সে খাবো!

হি-মা। কি ইলেম্ দেবে?

(এইখানে বেদে, মোড়ল-প্রদত্ত পুরস্কার-তালিকাটি যথাযথ আবৃত্তি করিয়া যাইবে)

হি-মা। তবে যা হয় কর্!

[প্রস্থানোদ্যতা]

বেদে। ও হিমির মা রে! তবে আশীর্ব্বাদ ক'রে যা রে!

হি-মা। বাঁ পায়ের গোল্লায় যা!

বেদে। এইবার বাঘ মারি?

---

* ইহাদের কথোপকথনের ভাষা যে সর্ব্বত্র মার্জ্জিত ও রুচি-সঙ্গত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহারা ঠিক যেমনটি বলে, আমি সেইমত লিখিয়া লইয়াছিলাম; কেবল নিতান্ত আপত্তিকর কথা ও সম্বোধনাদি বাদ দিয়া যেমনটি পাওয়া গিয়াছে, ঠিক তেমনই রাখিলাম।

(এইখানে, হিমির মা একটু আড়ালে দাঁড়াইবে এবং বেদে ব্যাঘ্র মারিতে গিয়া নিজেই ব্যাঘ্র দ্বারা নিহত হইবে। বেদে মৃত ব্যক্তির স্থায় ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলে হিমির মা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আবার দেখা দিবে)

হি-মা। ওরে * * * * রে! সেই কালেই বলেছিলুম যে, 'বাবা' নিয়ে আসিস্ না রে, বাবা! আমার এক হাঁড়ি পুঁইশাক কে খাবে রে! তোকে যে কত নিজের হাতে খাইয়ে মানুষ করলুম রে! (১) ওগো মোড়ল মশাই গো! কে বল্‌বে আমার কে এলো গো! আমার কি হ'ল গো! আমার যে আর কেউ নেই গো!

মো। কি, হ'ল কি? কাঁদিস্ কেনে?

হি-মা। ওগো আমার মোড়ল মশাই গো! আমাদের তাকে বাবায় খেয়েছে রে বাবা!

মো। তা বেশই ত হয়েছে; যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। তা ওকে কি চৌকিদার ডেকে বাঁকার (২) ধারে ফেলে দেবো?

হি-মা। ওগো আমার মোড়ল মশাই গো! একটা

---

* * * * স্বামীকে সে এখানে এমন কতকগুলি আপত্তিকর সম্বোধনে অবিহিত করিবে যাহা, একমাত্র পিতৃগৃহস্থ নিকটতম আত্মীয়দিগকেই করা চলে।

(১) এই বাক্যটিকে কিছু বদ্‌লাইয়া দিতে হইল।

(২) বাঁকা—ভৈটা গ্রামের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র উপনদী; দামোদর নদের সহিত যোগ আছে। ইহারই তীরে মড়া পোড়ানো হয়।

রোঝা (১) ডেকে দাও গো! আমি তোমায় পঁচিশ পঁচিশ জুতো দোবো গো!

মো। দূর বেটী পাগল কোথাকার! তা তুই দাঁড়া দেখি।

(ওঝার দ্বারে গিয়া)

মো। কবরেজ মশাই! বাড়ীতে আছেন কি?

ওঝা। এত রাত্রে কে ডাকেরে বাপু? এই নাকে কাণে পায়ে হাতে তেল দিয়ে শুচ্ছি! (২)

মো। আমি গ্রামের মোড়ল; একবার বেরিয়ে আসুন ত; একটা বেদে-ছোঁড়া এসেছিল বাঘ নাচাতে, তাকে বাঘে খেয়েছে; সে বেটা ত ম'রে গেছে। আপনি একবার বাগিয়ে দেখুন, যদি বাঁচে।

ওঝা। আপনি ত এসেছেন, যেতে ত পারি; কিন্তু কি পাওয়া যাবে?

মো। তাদের কি আছে দেখি গে, দেখে ব্যবস্থা হবে।

(উভয়ে হিমির মায়ের নিকট আসিয়া)

মো। ওরে, 'রোঝা' ত এই এসেছে, কি দিতে পারিস্ বল্?

হি-মা। ওগো রোঝা মশাই গো! আমার হাতে পায়ে ধ'রে যা'তে না ভাল হয়, তাই ক'রে দাও গো! ভাল ক'রে দিলে পঁচিশ পঁচিশ জুতি দেবো গো!

---

(১) রোঝা—ওঝা! গ্রাম্য বৈদ্য-বিশেষ। মন্ত্র-তন্ত্র ও শিকড় প্রভৃতির সাহায্যে চিকিৎসা চালাইয়া থাকে।

(২) এই নাকে কাণে……শুচ্ছি—ইহা প্রাচীনদের মধ্যে আজও পল্লীগ্রামে প্রচলিত আছে। আধুনিক সভ্যতা-প্রসূত sleeping-dose এর মতই কার্য্য করিয়া থাকে ও বিশেষ আরাম-প্রদ।

ওঝা ! (সরোষে) মোড়ল মশাই, বলে কি দেখুন দেখি ?

মো। আহা, দেখেছেন না, ওর কি হয়েছে ? ওর কি মাথার ঠিক আছে ?

ওঝা। আচ্ছা রোগীটাকে দেখি একবার।

(গোড়ালীটা বাঁ হাতের দু' আঙ্গুলে নাড়ী দেখার ভঙ্গিতে ধরিয়া, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে)

ও মোড়ল মশাই, এ ত ভাল হবার নয় !

হি-মা। যাতে না ভাল হয় তাই ক'রে দে রে বাবা !

মো। তুই চুপ কর্। (রোঝার প্রতি) দেখুন, দেখুন আপনি না পারলে আর পারবে কে ?

ওঝা। আচ্ছা, তবে দেখি।

(এইবার বেদেকে ছুঁইতে যাইবার সময় বাঘ দু'টি ওঝার দিকে লাফাইয়া পড়িবে)

ওরে বাবা ! মোড়ল মশাই, আগে বাঘগুলোকে মন্ত্র দিয়ে বাঁধি, তা নয় ত আমাকেই খেয়ে ফেল্‌বে এখ্‌নি।

(অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া মন্ত্র আবৃত্তি)

'এই, আঁচির (১) বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের পা'—আর শালার বাঘ চল্‌তে পারবে না !

'এই, আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের চোখ'—এইবার বেটা অন্ধ হ'ল !

---

(১) আঁচির—পাঁচির, প্রাচীরাদি। এই সব মন্ত্রের সর্ব্বস্থানে অর্থ হয় না ; আবোল-তাবোল শ্রুতিরঞ্জক বাক্যাড়ম্বর ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে। তবে কোনো কোনো প্রাদেশিকতা-দোষদুষ্ট শব্দের অর্থ দিলাম।

'এই, হুঁকোর জল, কেঁচোর মাটি
লাগরে বাঘার দাঁত কপাটি !

ছাঁচি কুম্‌ড়ো বেড়াল পোড়া,
ভাঙরে বাঘের দাঁতের গোড়া !

যদি রে বাঘ নড়িস্ চড়িস্,
খ্যাঁক্‌শেয়ালীর দিব্যি তোকে।'

এই ত মোড়ল মশাই, বাঘ ত বেঁধে দিইছি ; দেখুন একবার মন্ত্রের জোর, এবার রোগীটাকে দেখি।

(ওঝার মন্ত্রের শক্তি দেখিয়া স্বামীর ভবিষ্যৎসম্বন্ধে হিমির মা কিয়ৎপরিমাণে নিঃশঙ্ক হইয়াছিল এবং তাহার প্রকৃতিস্থ মন পুনরায় সংসারের পানে ফিরিয়া আসিল, সে বলিল :—)

হি-মা। ওগো কবরেজ মশাই, অমনি ক'রে আমার রান্নাঘরের দোয়ারটাও বন্ধ ক'রে দাও না গো ! আমি যে শেকলটা খুলে রেখেই চ'লে এসেছি গো ! আমার একটি হাঁড়ি পূঁইশাক রাঁধা আছে যে গো !

ওঝা। আচির পাঁচির ছাঁচির ঘর
মড়কোচা (১) দিয়ে দুয়ার কর !

(ওঝা এ শ্লোকটার আর ব্যাখ্যা করে না। এটা বোধ হয় হিমির মায়ের রান্নাঘরের 'দোয়ার' বন্ধ করিবার মন্ত্র ; কারণ, ইহাতে গৃহের চতুর্দ্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া দুয়ারটি ছাদের দিক দিয়া নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে।)

---

(১) মড়কোচা—খড়ের চালের শীর্ষদেশকে 'মড়কোচা' বলে।

এইরূপে, একটা অবান্তর ব্যাপারে নিজের শক্তি খরচ করিয়া ওঝা মহাশয় পুনরায় ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের সম্বন্ধে এই সার্টিফিকেট দাখিল করেন ঃ—

এনার কাঠি বেনার বোঝা
আমার নাম ঠন্ঠনে রোঝা !

(অতঃপর তিনি রোগী ঝাড়িতে আরম্ভ করেন) ঃ—

(সুর করিয়া)

ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি আতা
নেড়ে-চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে মাথা !
ঝাড়লাল ঝুড়লাম খেয়ে একটি পাণ,
নেড়ে-চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে কাণ !
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি মুড়ি,
নেড়ে-চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে ভুঁড়ি !
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি কুঁকড়ো,
নেড়ে-চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে বুকড়ো! (১)

এই ভাবে রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণান্তর তিনি পরিশেষে এই মন্তব্য দিলেন ঃ—

ওঝা। ঝাড়লাম ঝুড়লাম না পারলাম রাখতে,
কল্সী কোদাল জোগাড় কর, যম এসেছে নিতে !
ঝাড়লাম ঝুড়লাম শোয়ালাম খাটে,
রাত পোয়ালে (২) দেখি ছোঁড়াকে নিমতলার ঘাটে !

---

(১) বুকড়ো—বুক, বক্ষোদেশ।

(২) পোয়ালে—পোহাইলে, প্রভাত হইলে।

ওঝা। ওহে বাবু, এ একবারে মৌয়ো (১) দাঁড়িয়েছে ; দেখি, মৌয়ো ঝাড়ি !

ওঝা। আল (২) গুড়াগুড়্ (৩) যায় রে মৌয়ো শামুক-খুলি (৪) থায়,
আধেক পথে গিয়ে মৌয়োর গায়ে এল জ্বর,
একলাফে যায় মৌয়ো যম-রাজার ঘর ! *

(এইথানে ওঝা মহাশয় আর একবার রোগীর গোড়ালি ধরিয়া নাড়ী দেখিবার পর বলিবেন)

"মোড়ল মশাই, দেখুন এবার মৌয়োটা কেটেছে !"

বলা বাহুল্য, মোড়ল মহাশয় হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া কবিরাজের এই সব দেখিতেছেন মাত্র। এরূপ অপূর্ব্ব নাড়ীজ্ঞান ইত্যাদির ধার তিনি ধারেন না !

(এইবার ওঝামহাশয় তাঁহার finishing touch দিতেছেন :—)

ওঝা। এ পুকুরের পানা রে ভাই ও পুকুরের পানা,
ফুড়ৎ ক'রে উড়ে গেল ছোঁড়ার গায়ের টেনা (৫)
আধ বাড়ীতে প'ড়লো গোবর !
গোবর করে চবর চবর !

---

(১) মৌয়ো—বাঘের বিষ।

(২) আল—ধানক্ষেতের আলিপথ।

(৩) গুড়াগুড়্—গুড়্ গুড়্ করিয়া, অর্থাৎ ধীরে ধীরে।

(৪) শামুক-খুলি—শামুকের খোলা।

* অর্থাৎ বাঘের বিষ মরিয়াছে।

(৫) টেনা—ছেঁড়া কাপড়।

ওর মা দেয় এক সের চাল, আমি খাই কড়মড়িয়ে!
ছোঁড়া ওঠে ধড়ফড়িয়ে!

(এইখানে বেদে হঠাৎ উঠিয়া চম্পট দিবে ও মহা কোলাহলের
মধ্যে 'বাঘ-নাচ' সমাপ্ত হইবে।)

চিঠির নেশা

অনেকের অনেক রকম নেশা থাকে, আমার নেশা ছিল চিঠি পাওয়াতে। নিজের নামে যেদিন খানকতক চিঠি থাকৃত, সেদিন মনে আমার বড় আনন্দ হ'ত। এই চিঠি পাবার জন্যে আমি অনেক বাজে খরচ কর্‌তাম। তখন বয়স ছিল কম, তবু এ চিঠি পাবার নেশা ছিল পূরো মাত্রায়।

আজকাল এ সখ ক'মে গিয়ে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বড় একটা চিঠি পত্রের খোঁজ রাখি না। এই বিতৃষ্ণার সঙ্গে সেই সময়কার একটি ঘটনার একটু যোগ আছে।...

সেবার আমাদের 'ম্যাট্রিকুলেশান' পরীক্ষা হয়ে গেল। একদিন ছাত্রাবাসে ব'সে ভাবছি, বাড়ী যাবো ; এমন সময় সতীর্থ বন্ধু সতীশ ধ'রে ব'স্‌ল যে তাদের বাড়ীতে গিয়ে প্রথম ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে হবে। বাড়ীতে সে কথা লিখে দিয়ে সতীশের সঙ্গে রওনা হলাম।

* * * * *

তাদের গ্রামটি মন্দ নয়। প্রথম দিন বেড়াতে বেরুনো গেল। বোশেখ মাসের শেষ, একটা গাছে বেশ পাকা আম ঝুলছে,—আমাদের গাছে-ওঠা কসরৎ জানা ছিল। আমি নীচে রইলাম সতীশ ওপরে উঠলো। ক্রমে ক্রমে সে যেই একটা খুব উঁচু ডালে উঠেছে, অম্‌নি ডালটা ভেঙ্গে গেল। সতীশ বেচারা সঙ্গে সঙ্গে 'পপাত ধরণী-

তলে'। তাকে তুল্‌তে গিয়ে দেখি, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না—তার পা ভেঙে গেছে। সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লো। অতি কষ্টে তাকে বাড়ী নিয়ে এলাম। সতীশের মা চূণ, হলুদ ইত্যাদির একটা প্রলেপ দিয়ে তাকে শুইয়ে রেখে দিলেন। সে আর উঠতে পারে না। ছুটির দিনে এ এক শুক্‌নো বিপদ। দুটো গোটা গোটা দিন কেটে গেল, তার পা আর সারে না, আমার পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তি নাই।

কি ক'রে সময় কাটানো যায় সেই চিন্তাই আমাদের সমস্ত সময় জুড়ে বসল। অনেক 'প্ল্যান্‌' ঠিক করা গেল কিন্তু কোনোটাই বেশ মনোমত হ্‌ল না। শেষে অনেক বুদ্ধি খরচ ক'রে একটা ফন্দী বের হ'ল। তাতে দুজনেরই সহানুভূতি থাকায় সেটা অমনি কার্য্যেও পরিণত হতে দেরী লাগ্‌লো না। এর সঙ্গে একটু মজা ছিল। দিনকতক আর কিছু না হোক খুব চিঠিপত্র আসবে, তার সন্দেহ ছিল না। তাই মতলবটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল।

কিছু পয়সা খরচ ক'রে আমরা প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজ 'অষ্টাবক্রে' একটি এই রকম বিজ্ঞাপন দিলাম :—

রাজপুর গ্রাম
কিসামৎগঞ্জ পোষ্ট
হুগলি জেলা

শ্রমক্লান্ত শিক্ষিত যুবক। পল্লীসংস্কারার্থ সাহায্য ও উপদেশ প্রার্থী। বন্ধুভাবে পত্রাদি লিখিলে অনুগৃহীত হইব। ইতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইটে ছাপা হবার তিন দিন পরে হরকরা এসে দশখানা চিঠি আমাদের দিয়ে গেল। আমরা ত খুব খুশী হয়ে চিঠি খুলতে বসে গেলাম। প্রত্যেকটাতেই সহানুভূতির কথা, প্রশংসা বা উপদেশ আছে। কোনোটাতে বা কার্য্য প্রণালীর একটা মোটামুটি নক্সা আছে। আমরা ত হেসেই অস্থির। শেষের চিঠিতে দেখি লেখা আছে মাত্র এই ক' ছত্র ঃ—

প্রিয় বন্ধু, আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আমরা জন-কয়েক আপাততঃ নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে আছি। যদি আমাদের দ্বারা আপনার কিছুমাত্র সাহায্য হয় তবে আমরা কৃতার্থ হব। ইতি—

ভবদীয়

সুধাংশুশেখর।

সতীশ আমায় জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে, চিঠিগুলোর আবার উত্তর দিতে হবে নাকি?" আমি বল্লাম "তাতে কি সন্দেহ আছে? যে রকম ব্যাপার ঘনিয়ে আসছে, শেষে মানে মানে নিষ্কৃতি পাওয়া দায় হবে দেখছি। তার ওপর ঠিকানাটা দিয়েছ, দেখ কোনো স্বদেশ-হিতৈষী এসে স্কন্ধে না ভর করেন!"

তখন দুজনে মিলে আমরা প্রত্যেক চিঠিরই একটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে উত্তর দিলাম। তাতে আরো কিছু পয়সা খ'স্‌লো। সেই নিষ্কর্ম্মা যুবকদের চিটির আর উত্তর দেওয়া হ'ল না, কেন না তাঁরা কোনো ঠিকানা দেন নাই।........

তার পরের দিন সতীশের বাবা আবার একতাড়া চিঠি নিয়ে, আমরা যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরে ঢুকে বল্লেন—"কি রে সোতো?

তোর যে অনেক বন্ধু হয়েছে দেখছি, পা ভাঙ্গার খবর দিয়েছিস, না ?" সতীশ বেচারার মুখ শুকিয়ে গেল। "কই দেখি ?" ব'লে কোনমতে চিঠিগুলো তার বাবার হাত থেকে নিয়ে বিছানায় রেখে দিলে।

তার বাবা চ'লে গেলে পর আমরা চিঠিগুলো খুলে দেখলাম যে, সে গুলোও একই রকম সহানুভূতি আর উপদেশে পূর্ণ। সেগুলো প্রত্যেকটা খুলে খুলে পড়া আর মাথা খাটিয়ে উত্তর দেওয়াতেই দিনটা কেটে গেল। মাথা খাটিয়ে বল্‌ছি, কেন না, কি লিখলে ভবিষ্যতে আর উত্তর পাবার আশঙ্কা থাকে না সেইমত লিখতে হচ্ছিল।

সতীশ মহা বিরক্ত হয়ে বল্লে "নীরদ ভাই, এ এক আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি। দেশশুদ্ধ লোক যদি চিঠি দেয়, তবে ত উত্তর দেওয়া দূরে থাক, পড়বারই সময় থাকে না। রোজ রোজ এই রকম চিঠি এলেই ত দফা সারবে। এরই মধ্যে আমার কাছে যা রেস্ত ছিল, বিজ্ঞাপনে আর চিঠি দিতেই সমস্ত ফুরিয়ে গেছে। বড়লোকী তামাসা চালানো ত আর আমার সাধ্য নয়। কি করি এখন ? আর আচ্ছা কম্ব্‌লি পাক্‌ড়েছি, ছোড়্‌তা ন্যাহি রে বাবা !"

আমি হাসতে হাসতে বললাম—"আর ভাই, সময় কাটছিল না, এ মজা মন্দ লাগ্‌ছে না ত !" "নিরেট গুরু ! ব্যাপার-খানা একবার তলিয়ে দেখ, কি ভয়ানক জমাট বেঁধেছে ! এ থেকে অনেক বিপদ হতে পারে। সময় কাটছিল না ?—এমন সময় কাস্তে করাত দিয়ে কাটতে হ'ত !" আমি আর কিছু না ব'লে চাপা হাসি নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সতীশের চিন্তা তখন হিমালয় ছাড়িয়ে উঠেছে !

তার পরদিন সে আমায় মিনতি ক'রে বললে "ভাই, আজ পিয়নকে পথেই আটকে চিঠিগুলো আদায় ক'রে নাও। আজকে আবার অতগুলো চিঠি দেখলে বাবা সমস্ত টের পাবেন।" সতীশের বাবা ভয়ানক রাশভারী লোক। অন্যায় সহ্য করতেন না—তবে অযথা কারু ওপর রাগও করতেন না। সতীশ তাঁকে খুব ভয় করত।

সে দিনের ডাক আমি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে লুকিয়ে নিয়ে এলাম। দেখলাম অন্যান্য চিঠির সঙ্গে সেই নিষ্কর্ম্মা যুবকদের সর্দ্দার সুধাংশুশেখরের হাতে লেখা একখানা চিঠি আছে। সতীশ আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে প'ড়ে পাংশু হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটেই মুখের ভাব এত গম্ভীর হয়ে পড়লো যেন হঠাৎ তার বয়েস দশ বছর বেড়ে গেছে। ব্যাপারখানা কি?—ব'লে চিঠিখানা নিয়ে প'ড়ে দেখলাম লেখা আছে —

স্বদেশভক্ত মহাপ্রাণ সতীশবাবু,

আমাদের পূর্ব্ব-লিখিত পত্রটি যথাসময়ে পেয়ে থাক্‌বেন। আমরা পাঁচজন শীঘ্র আপনার কাছে যাচ্ছি। কবে যাবো স্থিরতা নাই, তাই তারিখ দেওয়া হ'ল না। তবে যাবো নিশ্চয় ও পৌঁছেই আমরা আপনার কাজে সহায়তা করবো। উঠ্‌বো আপনারই ওখানে। আমাদের প্রীতি নমস্কার নেবেন। ইতি—

ভবদীয়

সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য।

আমি প'ড়ে বল্লাম "তাই ত, ভাবনার কথা বটে। এরা এলে একটা হাঙ্গামা বেধে যাবে। তোমার বাবা এই সব কীর্ত্তি-

কলাপ শুন্‌লে আর গুটিকতক ভদ্রলোককে মিথ্যে ঠকিয়ে এ রকম কষ্ট দিলে, যে আমাদের ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন না তা বুঝতেই পারছি। তা একটা টেলিগ্রাফ ক'রে না হয় ওদি'ক আসতে বারণ ক'রে দাও।"

মুখটা বিকৃত ক'রে, সতীশ গলাটা পঞ্চমে চড়িয়ে বল্লে "আহাম্মক! টেলিগ্রাফ ক'রবো কোথায়? ঠিকানা দিয়েছে কি ছাই?"

ঠিকইত, ঠিকানা দেয় নাই সে কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার-ও এবার ভয় হতে লাগল। সতীশ খুব ব্যস্ত হয়ে বললে "তুমি খাওয়া-দাওয়ার পর এই ক'দিন রোজ একটু আমাদের বাড়ীর পশ্চিমদিকের পুলটায় বসে থেক। যদি কোনোদিন তাদের দেখতে পাও ত সেইখান থেকেই ফিরিয়ে দিয়ো। বোলো সতীশবাবু ব'লে কোনো লোক এ গ্রামে নাই। ঠিকানাটা দিয়ে কি গণ্ডমূর্খের মতই না কাজ করেছি!"

আমি আর কি করি, ক্রমাগত ওপর ওপর দু'দিন সেই পুলের ওপর ছাতা মাথায় দিয়ে ব'সে সময় কাটাতে হল। স্ফূর্ত্তি ক'রে সময় কাটাতে গিয়ে যে খোলা মাঠে প্রচণ্ড বৈশাখী রোদে এমন কর্ম্ম-ভোগ পোহাতে হবে তা যদি আগে জানতাম তা হলে—যাক্, তিন দিনের দিন সতীশকে বললাম—'ওহে তোমার কোনো ভয় নাই। তারা কখনো আসবে না, ও সব ফক্কিকা। এখন আমারো আর পুলে ব'সে ব'সে ঠাণ্ডা হবার কোনো দরকার দেখি না।'

সতীশ ভয়ানক রেগে বল্‌লে—'তোমার বুদ্ধিকে বলি-হারি যাই। এরি মধ্যে কি? কবে আসবে যখন লেখেনি, দিন

পনের অন্ততঃ দেখা উচিত। যেমন যাচ্ছিলে তেমনি গিয়ে পুলে বোসো—কি ক'রবে বল। আমার পা-টা সেরে এলে তখন দুজনেই যাবো।'

মনে মনে শুধাংশুশেখর আর তার নিষ্কর্ম্মা দলের সব কয়টার মুণ্ড পাত করতে করতে পুলের দিকে চললাম। ব'সে থেকে থেকে ফেরবার জোগাড় করছি, তখন দেখি তিনটের ট্রেণের যাত্রীরা আসছে। তাদের মধ্যে পাঞ্জাবী-আঁটা গুটিকতক নব্যযুবকও দেখলাম। আমার মনটা অম্‌নি ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। এরাই তারা নয় ত? কি করা উচিত ভাববার অবসর না দিয়ে তাদেরই এক জন দেখলাম বরাবর আমায় লক্ষ্য ক'রে আসছে; আর সকলে পথের ধারে একটা আম বাগানে গিয়ে ঢুক্‌লো।

যে লোকটা আমার দিকে আসছিল তার পোষাক আর চলনের ভঙ্গি দেখেই আমার সেইদিকে সমস্ত মন পড়ে রইল, কিংকর্ত্তব্য ভাববার আর অবকাশ রইল না।

লোকটির ইয়া দাড়ি, ইয়া গোঁফ, পরনে মোটা খদ্দর, হাতে প্রকাণ্ড একটি বংশ-যষ্টি; চেহারাখানি বেশীরকমের লম্বা—বহরে তত বড় নয়। পাগড়ীতে কপাল ও মাথা মোড়া। সে চলছিল বেশ মজা ক'রে। এখন একরকম চলে, আবার সেটা যেন পছন্দ হচ্ছে না, এই ভাব দেখিয়ে চলনের ভঙ্গিটা আবার পালটে নেয়। দূর থেকে মনে হ'ল তার গোঁফ-দাড়ি সত্ত্বেও মুখখানি হাসি-হাসি। কিন্তু কাছে আসতেই বুঝলাম সে আমার দেখার ভুল; তেমন গম্ভীর মুখে ভীষণতার আভাস আমি আর পূর্ব্বে দেখেছি ব'লে স্মরণ হল না। হঠাৎ সে আমায় সচকিত ক'রে জিজ্ঞাসা করে উঠলো—"এইটে ত রাজপুর গ্রাম, নয় মশায়? সতীশ-

বাবুর বাড়ী কোন্‌টা বলতে পারেন? সতীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়? মহাশয়েরও বোধ হয় এই গ্রামে বাস, নয়?"

আমি একটু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম "আজ্ঞে না, আমি এ গ্রামে বেড়াতে এসেছি।"

মুখখানাকে এবার খুবই গম্ভীর ক'রে আগন্তুক আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "তা বেশ ক'রেছেন, তা কোন্‌টা সতীশবাবুর বাড়ী?"

দোষের মধ্যে এমন একটা দুর্ব্বলতা থাকে যে দোষী কখনো সেটা অতিক্রম করতে পারে না। মনে আমি জানতাম আমি অপরাধী—আর এই ভদ্রলোকের নাছোড়বান্দা ভীষণ ভাব-গতিক দেখে আমার দুষ্টামি বুদ্ধি সবটুকু উড়ে গেল। খুব ভালমানুষের মত তাঁকে বলে ফেললাম "আসুন আমার সঙ্গে"। সেই সঙ্গে ভাবলাম সতীশকে আমি বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রবো। তার বাবার সুমুখে সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে যা কিছু তিরস্কার নিজেই ভোগ করব—আমার তাতে বেশী কিছু এসে যাবে না, কিন্তু রাগটা সতীশের ওপর হ'লে পিতাপুত্র সম্পর্কটা বিশেষ মধুর হবে না।

সমস্যাটার এক রকম একটা সমাধান ক'রে নিয়ে এই ভদ্রলোককে সতীশের ঘর দেখিয়ে দিলাম। সতীশ বৈঠকখানার খাটের ওপর শুয়ে ছিল। লোকটি একবারে মহাপরিচিতের মত সেই ঘরে ঢুকে তার বিছানার এক ধারে বসে বললেন—"আমি আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম পেয়েছেন নিশ্চয়। আমারই নাম সুধাংশুশেখর আর এই আপনার সেই বিজ্ঞাপন। বলতে বলতে সেই সংখ্যার 'অষ্টাবক্রখানা' তাঁর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বেরিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে আমারও বুকটা দুর দুর করে উঠল—সতীশ ত রক্তহীন মুখে আগন্তুকের পানে চেয়ে ! এমন সময় সতীশের বাবা ডাকলেন অন্দর হতে ঃ—"স'তো, কে এল রে ?" তখন সতীশের মুখ-খানা যা হয়ে গেল তা দেখবার জিনিষ। অন্য কোনো রকমে তা' বোঝানো যায় না। 'ভাবের অভিব্যক্তিওয়ালাদের' ভাগ্যে আর কখনো এমন জীবন্ত 'মডেল' জুটবে না। আর আমাবও অবস্থা ঠিক অষ্টমীর পাঁঠার মত হয়ে এল। যেন সদ্য সদ্য বলি হবে। কেন না আমি তখন মনশ্চক্ষে আমার সমস্ত দোষ স্বীকার ও উভয়ের হ'য়ে সতীশের বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার অভিনয়টা দেখছি ও প্রতি মুহূর্ত্তে সেটা বাস্তবে পরিণত করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। সতীশ জান্ত তার বাবার কথার কোনো একটা জবাব না দেওয়া হ'লে তিনি চ'লে আসবেন। তাই সে যতদূর সম্ভব গলাটা স্বাভাবিক করবার চেষ্টা ক'রে বলে উঠলো —'কেউ নয় বাবা, এই আমারই।'

আগন্তুক ভদ্রলোক ততক্ষণ অস্থির হয়ে পড়েছেন, তিনি সব চুপ চাপ দেখে বললেন "আমার অন্য চার জন সহকর্ম্মী আম বাগানে অপেক্ষা করছেন—তাঁদের ডেকে আনিগে। সংস্কার কার্য্য আমরা কাল থেকে আরম্ভ করে দোবো। আজ আর রাত্রে আমাদের জন্যে বেশী কিছু করবেন না। আমরা চারজন রাত্রে ভাতই খাই, তবে শরৎবাবু জমিদারের ছেলে কি না, তাঁর জন্যে খানকতক লুচি হলেই হবে"—এইটে ব'লেই আর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে সুধাংশু বাবু তাঁর সাথীদের ডাকতে বেরিয়ে গেলেন। তখন সতীশ ভয়ার্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো, ও মশায়, সুধাংশু বাবু, শুনে যান। তিনি ফিরে আসতেই আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে সে হাত দুটি

জোড় করে বলে উঠলো—“মশায় আমায় ক্ষমা করুন, ও বিজ্ঞাপনটা আমরা তামাসা করবার মতলবে ছাপিয়েছিলুম। আপনাদের অনর্থক কষ্ট দিয়েছি। বাবার কাণে একথা উঠলে আর আমার রক্ষা থাকবে না। দয়া ক'রে আপনারা ফিরে যান—আর অনর্থক কষ্ট পেতে হল ব'লে কিছু মনে করবেন না।”

উত্তরে সুধাংশু বাবু বেশ উচ্চ-কণ্ঠেই বললেন “মশায় আমরা যে-সে লোক নই, সহজে আপনাকে ছাড়বো না। এ রকম তামাসা ত ভাল নয়। আপনার বাবাকে জানানো ত আমার সর্ব্বাগ্রে উচিত।”

এমন সময় সতীশের বাবার চটির শব্দ শোনা গেল—আর রক্ষা নাই। সতীশ তখন সুধাংশু বাবুর হাত দুটি ধ'রে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে “আমায় দয়া করুন মশায়, বাবাকে কিছু বলবেন না; আর কখনো এমন কাজ করবো না।”

সুধাংশু বাবু বললেন “ঠিক্ বলছেন?” চটির শব্দ তখন স্পষ্ট হয়ে এসেছে, উত্তর হল “নিশ্চয়।” “আচ্ছা মশায়” বলে সেই অদ্ভুত ভদ্রলোকটি খিল খিল করে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক নিমেষের মধ্যে তাঁর লাঠি পাগড়ী, দাড়ি গোঁফ, সমস্তই খাটের তলায় আত্মগোপন ক'রল।

তখন সেই আমাদের পরেশ, ঠিক তেম্‌নি শান্ত নির্দ্দোষ মুখের ভাব নিয়ে আমাদের সুমুখে দাঁড়ালো, আর সতীশের বাবাও সেই সঙ্গে ঘরে ঢুক্‌লেন।

“তাই ত বলি, ঘরে যেন তিন জন লোকের কথা শোনা যাচ্ছে। তা পরেশ এসেছ, বোসো বাবা বোসো—হ্যাঁরে স'তো

আমায় যে বল্লি 'কেউ নয় বাবা', এতক্ষণ জান্‌লে পরেশের শুদ্ধ জলখাবার হয়ে যেত।"

পরেশ বেশ শান্তভাবে সতীশের পিতার পায়ে প্রণাম ক'রল। তিনি আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন "আমি বাড়ীর মধ্যে যাই, তোমাদের জলখাবারের বন্দোবস্ত দেখিগে—তোমরা ততক্ষণ গল্প কর।"

পরেশ বল্‌লে "আমার সঙ্গে সতীশের আর চারজন বন্ধু এসেছে, তারা আম বাগানে বেড়াচ্ছে।"

সতীশের বাবা বল্‌লেন—"তা বেশই হ'ল। স'তো পা ভেঙে পড়ে আছে, তোমরা অনেকগুলি হ'লে, তবু গল্প-সল্প ক'রে সময়টা আনন্দেই কাটাবে। পরীক্ষার পর এ একটু ভাল"—এই ব'লে তিনি চলে গেলেন। পরেশও হাস্‌তে হাস্‌তে অরুণ, ধীরেন, ও সরোজকে নিয়ে এল।

সেদিন রাত্রে, যাদের ভাত খাওয়া অভ্যাস, তারাও শরৎবাবুর মত জমিদার-নন্দন না হয়েই দিস্তে দিস্তে লুচি উড়িয়েছিল।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ *

সঠিক স্মরণ করবার উপায় নেই, তবে সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধীর প্রথম নন্-কো-অপারেশন্ প্রচারের সময় থেকেই হবে, আমাদের প্রকাশ প্রচণ্ড 'খদ্দরাইট্' হ'য়ে উঠ্লো। একজন নিরীহ 'গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্টের' ছেলের ক্ষীণ শরীরের মধ্যে যে এতখানি স্বদেশ প্রেমের তেজ থাকৃতে পারে তা আমরা কোনো কালেই ভাবিনি।

পয়সা পেলেই আমরা যেতাম বায়োস্কোপে নয়ত এক-আধখানা ভাল ইংরাজী নভেল কিনতাম, প্রকাশ কিন্তু পয়সা পেলেই 'ইয়াং ইণ্ডিয়ার' চাঁদা জমাত আর দেশ-নেতাদের ছবি কিনে বেশ খরচ করে বাঁধিয়ে রাখ্তো। কলেজের ফেরৎ আমরা হয়ত অমূল্য স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য হেদো বা গোল-দীঘিতে পাক খেতাম আর প্রকাশকে দেখ্তে পাওয়া যেত মির্জ্জাপুর পার্কে অথবা এ্যালবার্ট হলে—গলদঘর্ম্ম হ'য়ে, ভীড় ঠেলে কোনো স্বদেশ প্রেমিকের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনছে।

* গল্পটি ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে লেখা; কংগ্রেসের মিটিং শেষ হইবার ঠিক পরেই; সুতরাং ইহা আগাগোড়া কল্পনাপ্রসূত; সত্যের সহিত ইহার কোনো সামঞ্জস্য নাই এবং সামঞ্জস্য-বিধানের কোনো চেষ্টাও করি নাই। ইহাকে একটি নিছক 'নক্সা'-চিত্রের মত ধরা যাইতে পারে।—লেখক।

এ হেন প্রকাশের পিতা একদিন অবিবেচকের মত মারা গেলেন। বাবার অসন্তোষের ভয়েই প্রকাশ এতদিন কলেজ ছাড়্‌তে পারেনি, এখন সে মনের সাধে থার্ড ইয়ারের মধ্যিখানেই পড়াশুনায় কষি টান্‌লে! পূরো দমে খদ্দরের জামা-কাপড় তৈরী হতে লাগ্‌লো, দোকান থেকে বোঝা বোঝা স্বদেশী বই আস্‌তে লাগলো, কিন্তু প্রকাশের জন্যে তার বাবা কোনো জমিদারী রেখে যান নেই। সুতরাং যখন কাপড়ের দেকান ও বইএর দোকান থেকে তাগাদা এলো তখন প্রকাশ শুক্‌নো মুখে আবিষ্কার কর্‌লো যে সে বাপের বড় ছেলে। বাবার বন্ধুদের সুপারিশে মার্চ্চেণ্ট্‌-অফিসে একটা চাক্‌রী পাওয়া মাত্রই অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সেটা নিতে হ'ল। কিন্তু কেরাণীগিরি ক'রতে হ'লেও সে মনে প্রাণে নন্‌-কো-অপারেটার ও একজন আদর্শ স্বদেশ-প্রেমিক ছিল। নিয়মিত ভাবে খদ্দর কেনা, 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' চাঁদা দেওয়া, স্বদেশী বক্তৃতা শোনা চল্‌তে লাগলো। কেরাণীগিরি করে বটে কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অফিসে ত' নয়, এমন কি ইংরেজ অফিসেও নয়,—একটা জার্ম্মাণ অফিসে, এইটেই ছিল তার সান্ত্বনা। তার পৈত্রিক ভাঙ্গা বাড়ীটার নীচেকার বাইরের ঘরে একটা সেক্‌রা ভাড়াটে ছিল, বাবা মারা যেতেই প্রকাশ তাকে উঠিয়ে দিয়ে ঘরটাকে পরিষ্কার ক'রে সেখানে "স্বরাজ বিধায়িনী সভার" অধিবেশন করতে লাগলো। অফিসের পর রোজ রাত ন'টা দশটা পর্য্যন্ত সেখানে গরম গরম পলিটিক্‌স্‌, তেমনি গরম চা, গান্ধীমার্কা বিড়ি ও ঝাল ঝাল ছাঁচিপান চল্‌তো। প্রকাশের স্ত্রী একদিন ঐ বাজে খরচের কথাটার উল্লেখ করতে গিয়ে এমন বিপদে পড়েছিল যে আর কখনো তা'র ওদিকে মন দেবার ইচ্ছে হ'ত না। স্ত্রীকেও সে সময়ে অসময়ে আশ্বাস দিত যে সে 'ফিমেল্‌

ইম্যান্‌সিপেশনের' পক্ষপাতী ও দেশ তৈরী হ'য়ে এলেই সে কমলাকেই প্রথম স্ত্রী-স্বাধীনতা দান ক'রে সকলের দৃষ্টান্ত-স্থল হবে। কমলা, কোনাদিন সেই সুদিনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিল কিনা খবর পাওয়া যায় নাই।

এখানে পাঠক পাঠিকাদের স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে আমার এই গল্পটা ১৯২৮ সালের শেষাশেষি সময়কার। এখন ১৯৩২-এর শেষ। এই চার বছরে গঙ্গায় অনেক জল ব'য়ে গেছে—স্ত্রী স্বাধীনতার যে স্বপ্ন প্রকাশ তখন কল্পনা-নেত্রে দেখেছিল এখন হয়ত তা'র দশ আনা রকম সে চর্ম্মচক্ষেই চতুর্দ্দিকে দেখ্‌ছে এবং কমলাও হয়ত তার যথাযোগ্য অধিকার ভুঞ্জন কর্‌ছে কিন্তু আমরা সে সবের কথা বল্‌তে বসিনি।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

১৯২৮ সালের কংগ্রেস। পার্ক সার্কাসের চেহারাটা সার্কাসের রঙ্গভূমির চেয়েও বহুল পরিমাণে জমকালো হ'য়ে উঠেছে; শতশত তাঁবু, হাজার হাজার লোক, অসংখ্য ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা। চানাচুর-ওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশুদ্ধ দেশী চিনির মিষ্টান্ন বিক্রেতার সমাবেশ। বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়োদের পর্য্যন্ত মনে একটা অজানা আশার শিহরণ। সমস্ত কংগ্রেস-সিজ্‌নের একখানা টিকিটের দাম দশ টাকা। প্রকাশ বিয়ের আংটি বাঁধা রেখে একখানা টিকিট কিনে ফেল্‌লে। টিকিট কেনার এই গোপন ইতিহাসটা ব্যক্ত ক'রে প্রকাশকে অপদস্থ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—কংগ্রেসের প্রতি

তার আন্তরিক টান যে কতখানি ছিল এ শুধু তারই একটা সামান্য পরিচয়।

*   *   *   *   *

কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন হ'য়ে গেল। প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে বাইরে আস্‌বামাত্র একটা ভিখারী প্রকাশের সামনে হাত পাত্‌লে, প্রকাশ পকেটে হাত দিতেই একটা আধুলি উঠে এল। হাসি-মুখে সেইটেই তার হাতে ফেলে দিয়ে সে হন্‌ হন্‌ ক'রে গিয়ে একটা 'বাসে' উঠে বস্‌লো। পাশেই একটা সাহেব—প্রকাশ তার দিকে তাকায় আর গম্ভীর ভাবে 'হুঁ' 'হুঁ' করে। ভাবটা এই যে,—তোমাদের বিলি-ব্যবস্থা ত এইমাত্র হয়ে গেল? চড়ো, আর যে ক'টা দিন পারো, ক'লকাতার বাসে চ'ড়ে নাও তারপর দেশে গিয়ে ত সেই ফুট্‌পাথে হাঁট্‌তে হবে?

কলেজষ্ট্রীটের মোড়ে নেমেই প্রকাশ সাড়ে চার টাকা দিয়ে কমলার জন্য জরী দেওয়া নাগ্‌রা জুতো কিন্‌লে। বাড়ী ঢুকেই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে ডাক্‌লে, "ওগো—কোথায়—শুন্‌ছো—?—শিগ্রী, এ দিকে!" কমলা হোঁচট্‌ খেতে খেতে বেঁচে গিয়ে ছুটে এলো।

"কিগো? কি হ'ল?"

"হয়েছে, অনেক কিছুই হয়েছে, পরে বল্‌ছি, আগে নাও এইটে ধর—এক বছর পরে ভারী কাজে লাগ্‌বে।"

কমলা প্যাকেট খুলে দেখে একজোড়া নাগ্‌রা। বল্‌লে "কি এমন মহা কাজে লাগ্‌বে শুনি? উঃ যেমন ক'রে চেঁচাচ্ছিলে ভাবলুম বুঝি বা কী-না-কী-ই একটা হয়েছে!"

"কী-না-কী-ই ত হয়েছে। ঐ নাও জুতো, আর আসুক

৩১শে ডিসেম্বর ফিরে,—স্বরাজ না হয়ত ঐটে আমার পিঠে বসিয়ো, আর হয়ত ঐটে প'রে গড়ের মাঠে বেড়িয়ো—তখন, বুঝেছো কিনা, স্বাধীন গো স্বাধীন! একেবারে স্বাধীন—তুমি স্বাধীন—আমি স্বাধীন—"

"আহা ছিরি দেখ কথার!" ব'লে কমলা জুতোর প্যাকেট্‌টা ফেলে রেখে, যেমন এসেছিল তেম্‌নি চট্‌পট্‌ ক'রে স'রে পড়লো।

প্রকাশ ছাড়বার পাত্র নয়; সে বল্‌লে, শোনো শোনো পালিয়োনা। আসুক ৩১শে ডিসেম্বর নাইন্টিন্‌ টোয়েন্টি নাইন, তার পর দেখবে কি হয়! সেদিন রাত বারোটার পর, বুঝেছ কিনা, তুমি স্বাধীন, আমি স্বাধীন, নবীন বাবু স্বাধীন, সমস্ত ভারত স্বাধীন! তখন কি আর কেউ সাহেবদের তোয়াক্কা রাখ্‌বো? ধর্ম্মতলা আর চৌরঙ্গীর যত বড় বড় বাড়ীগুলো সব খালি হ'য়ে যাবে; কে বল্‌তে পারে 'হোয়াইট্‌এ্যাওয়ে লেইডল'র বাড়ীটাতেই আমরা হয় ত একটা ফ্ল্যাট্‌ পেয়ে যাব। আমার, বুঝেছ কি না, ঐ দেশনেতারা যা খাতির করেন, ও বাড়ী চাইলেই দিয়ে দেবেন। তারপর ঐ পার্ক ষ্ট্রীটের দোকান থেকে একখানা মাঝারী রকম আমেরিকান গাড়ী—সে তখন চাইলেই পাওয়া যাবে,—তখন ত আর ইংরেজ-রাজত্ব থাক্‌বে না! যারা যত বড় দেশ-সেবক তাদের খাতির হবে তত বেশী। আর আমি ত, বুঝেছ কিনা, সেই ছেলেবেলা থেকেই 'স্বদেশী'; সুতরাং ও মোটর-টটর্‌ কি আর আটকাবে? তারপর তোমাতে আমাতে ঐ মোটরে ক'রে—"

"বলি, তোমার ভাত বাড়বো? শীতকাল, ভাত ত

কড়্‌কড়িয়ে গেছেই, তোমার সেই দুটো 'ভিটামিন্' ভেজেছিলুম, ভেবেছিলুম গরম গরম দোব, তাও যে—রাত ক'রে এলে!"

"ও মূলো ভেজেছিলে? তা ভাজ্‌লে কেন? গরম তেলে দিলেই ত ভিটামিন্ সব নষ্ট হ'য়ে যায়। ও সব এবার থেকে সেদ্ধো ক'রে দিও।"

তৃতীয় পর্ব্ব

পরদিন সন্ধ্যায় স্বরাজবিধায়িনী সভার সভ্যেরা পরম চমৎকৃত হয়ে গেল। শুধু চা-চুরুট নয়; সিঙাড়া, কচুরী আলুর দম—একেবারে ধূমায়িত!

সভারম্ভে, সভাপতি প্রকাশচন্দ্র একটি ছোট বক্তৃতা দিলে। "ভাই সব, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। তোমরা ত সবাই শুনেছ আমরা ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রাত বারোটার পর থেকে পূর্ণ-স্বাধীনতা বা 'স্বরাজ' পাব। কংগ্রেসের 'ওয়ার্কিং কমিটী'তে আজ ঠিক হ'ল যে আমরা সবাই ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটা পর্য্যন্ত, ঠিক বারোটা পর্য্যন্ত, অপেক্ষা ক'রবো—তার মধ্যে যদি ইংরেজেরা আমাদের 'ডোমিনিয়ন্ ষ্ট্যাটাস্' দিলে তবেই, নয়ত বারোটা বেজে এক মিনিটের পর থেকেই 'কম্‌প্লিট্ ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স্' অর্থাৎ কিনা 'পূর্ণ-স্বরাজ' জারী করা হবে। আর ভাবনা কিসের বল? রাধাও-নাচবে না, দশ মণ তেলও পুড়বে না—ইংরাজেরাও 'ডোমিনিয়ন্ ষ্ট্যাটাস্ দেবে না; সুতরাং পয়লা জানুয়ারী ১৯৩০ থেকে আমরা স্বাধীন।"

বিমল বাবু ছিলেন সভার মধ্যে বিজ্ঞ ব'লে বিখ্যাত। তিনি খ্যাতি বজায় রেখে গম্ভীরভাবে ব'লে উঠলেন—"আচ্ছা, এই বেলা ত নিজেদের একটা গতি ক'রে নিতে হবে? কি বল নরেন ভায়া? চল, কাল থেকে আমরা প্রকাশকে সঙ্গে ক'রে যাঁদের ভবিষ্যতে বাংলা দেশের রাজা হবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, তাঁদের কাছে দরবার করিগে। এখন থেকে একটা ভালো পোষ্ট জোগাড় ক'রে কথাবার্ত্তা পাকা ক'রে রাখা কি ভালো হবে না?" সকলেই বিমল বাবুর কথা সমর্থন করায় ঠিক হয়ে গেল যে প্রকাশ প্রমুখ সভার সকল সভ্যই এখন থেকে স্বাধীন-ভারতের এক একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নেবার ব্যবস্থা করবেন। আশায়, আনন্দে প্রত্যেকের মুখ উজ্জ্বল ও বুক দশ হাত ক'রে চওড়া হ'য়ে উঠ্লো!

চতুর্থ পর্ব্ব

৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯, প্রাতঃকাল। প্রকাশ একটা গান্ধী-বিড়ি টান্‌ছে, ললাট কুঞ্চিত, সুমুখে একতাড়া 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'। কাশীর চিনি দেওয়া 'ভট্‌চায্যের চা' বহুক্ষণ ফুরিয়ে গেছে, বেলা-ও প্রায় ন'টা হবে; কমলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে; "ওগো আজ কি নাওয়া-খাওয়া হবে না? আপিস্ যাবে কখন?"

প্রকাশ কি একটা গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিল, হঠাৎ চমকে উঠে রুক্ষ ভাবে বল্‌লে, "কি, কি, কি বল্‌ছ?"

"বলি, ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেছ? আপিস যাবে কখন?"

—"অফিস্? ড্যাম্ ইয়োর অফিস্। গিন্নী, কাল থেকে কি হবে বুঝেছ কি? আজকের দিনে-ও আবার অফিস যাবো? ছোঃ! কাল যখন 'ম্যাক্‌নোমারা' আমায় বল্লে "মিটার, তোমার আজকাল বড় কাজে গাফিলতী হচ্ছে; আমি তোমায় 'ওয়ার্নিং' দিচ্ছি।" আমি তার মুখের ওপর পষ্টই ব'লে দিলুম, 'মিষ্টার ম্যাকনোমারা, তোমরা যদি কাল রাত বারোটার মধ্যে আমাদের 'ডোমিনিয়ান্ ষ্ট্যাটাস্' না দাও, তবে পরশু থেকে আমরা 'কম্‌প্লিট্-ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্' পাবো। কাজ যে এখনো কচ্ছি সে-ই ঢের, বাঙ্গালী আর তোমাদের 'আণ্ডারে' খাট্‌বে না। বোকা সায়েব উত্তরে কি বল্‌লে জানো? বল্‌লে "ওয়েল, ওয়েল, কাল মাসের পয়লা তারিখ, মিটার, বুঝে চল।" বুঝে চল্‌বো আর ছাই, একেবারে কাল যাবো, নবীন বাবুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো, ও ম্যানেজারের পোষ্ট-টা তাঁকেই দোবো।

—"তা' দিয়ো, কিন্তু করেছো কি? চাক্‌রী কি আর থাক্‌বে? এরপর ছেলেপিলে নিয়ে খাবে কি?"

খাবো? খাবো পোলাও-কালিয়া-কোপ্তা-কোর্ম্মা, পেস্তা-বাদাম—আর কি তোমার ঐ হতচ্ছাড়া আলু-পোস্ত আর খাড়া-চচ্চড়ী খাব? কাল সকালেই ত আমি—। তোমায় কি ক'রে আর বোঝাব বল? এই গোটা কল্‌কাতা শহরটা দশভাগে ভাগ হয়েছে, এক এক ভাগে এক এক হাজার 'ভলেন্টিয়ার' আর একজন ক'রে 'কমাণ্ডিং অফিসার।' আর এই অফিসারের ওপর একজন ক'রে সচিব। এই সচিবের হাতেই 'ট্যাক্স্' আদায়, টাকা রাখা, বিভাগের মধ্যেকার যা' কিছু ব্যবস্থা করার ভার, সমস্তই থাক্‌বে। আরে, তুমি ভাবো কি? —এই যে এতদিন ধ'রে দেশের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত,

খাতির-সুপারিশ, আসা-যাওয়া করলুম, একি মিছেমিছি না কি? আমি কোথাকার সচিব হব জানো? উত্তরে বিডন ষ্ট্রীট্ (কাল থেকে ও নামটা বদ্‌লে দেওয়া হবে) আমি চেষ্টা কর্‌ছি যাতে ওটা প্রকাশ ষ্ট্রীট্ হয়, কারণ বল্‌তে গেলে এ অঞ্চলে আমার মত স্বদেশভক্ত আর কে আছে বল? দুদিন যাক্, তোমার নামেও যাতে একটা লেন-টেন কিছু হয়, তার ব্যবস্থাও কি আর ক'রবো না ভেবেছ?

—"আঃ, থাম্‌বে?"

"—থাম্‌বো কি শোনো,—উত্তরে বিডন ষ্ট্রীট, দক্ষিণে হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত এই বিভাগটা থাক্‌বে আমার হাতে। টাকার কি আর অভাব থাক্‌বে কমলা? আজ পাঁচ দিন ধ'রে ত নোটগুলো ছুই না, ওর আর দাম কি আছে বল? টাকাগুলো ত এবার গলিয়ে বারো আনায় বিক্রী কর্‌তে হবে। জীবন-টা 'এম্‌প্রেস্ কোম্পানীর' কাছে 'ইন্‌সিওর' করা ছিল, পাওনা মিটিয়ে জীবনটাকে ছেড়ে দেবার জন্যে দরখাস্ত ক'রেছিলাম, তাও ত দিন দশেক হয়ে গেল, ব্যাটারা কি জোচ্চোর দেখেছ? তল্পী-তল্পা গুটিয়ে, আজ এগারোটা উনষাট্ মিনিটের আগে কোনো একটা ট্রেণ ধরে' ও 'এম্‌প্রেস্-টেম্‌প্রেস্' সবাই তো ইংল্যাণ্ডের দিকে রওনা হবে! আমার ত টাকা ক'টাই গেলো আর কি?

"অফিস্ যেতে বল্‌ছ? অফিস গিয়েই বা কি হবে, আর অফিসের মাইনে নিয়েই বা কি হবে? মাইনে ত দেবে পাঁচ খানা দশ টাকার নোট। তা কাল তাতে খোকার দুধটা-ও গরম হবে না। আর আজ যে ঐ নোট নিয়ে দোকানের দেনা শোধ দিয়ে এসে দেশের লোক্‌কেই ঠকাবো, তা' আমি পার্‌ব না। কাল তো আবার

স্বরাজ হয়ে গেলে আমারই উঁচু মাথা হেঁট হবে! সেই লোকগুলোই এসে বল্‌বে, সচিব মশায়, কাল যে কাগজ দিয়ে গেছেন, সেগুলো ফেরত নিয়ে, আমাদের দশটা ক'রে স্বরাজ-মুদ্রা দিন।—"

কমলা দেখ্‌লে, এ ভাবে কথাবার্ত্তা চালালে সেদিন আর কারো স্নানাহার হবার আশা নেই, তাই সে সেখান থেকে স'রে পড়লো, আর যাবার সময় ব'লে গেল "সচিব মশায়, চাল বাড়ন্ত, সেটা জানিয়ে গেলুম, ওবেলা বাজার না কর্‌লে কাল সকালে হাঁড়ি চড়বে না! তেল, ঘি, মশ্‌লা, ডাল, সবই ফুরিয়েছে।"

সকালের এ বিপদটা এ রকমভাবে এখানেই শেষ হল। প্রকাশ আর সেদিন অফিস গেল না। নাকে-মুখে দুটো খেয়েই সে সেদিনকার 'স্বরাজ-বিধায়িনী' সভার বিশেষ অধিবেশনের জোগাড়ে লেগে গেল। সেদিন তার অনেক কাজ, তা'র কি একটুও মাথা চুল্‌কোবার সময় আছে? চাকরটার হাত দিয়ে প্রত্যেক মেম্বারের বাড়ীতে 'স্লিপ্' পাঠিয়ে দিলে, অফিস থেকে ফিরেই তারা যেন চ'লে আসে; শত কাজ থাক্‌লেও অন্য কোথাও না যায়।

সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই যথানিয়মে একে একে নবীন বাবু, বিপিনবাবু সকলেই আসতে শুরু কর্‌লেন, সভার প্রারম্ভে প্রকাশ হাতযোড় ক'রে প্রথমেই সবিনয়ে বল্লে, "ভাই সব, সভা আরম্ভ হবার আগেই আমি আপনাদের কাছে একটা ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা-ভিক্ষা করছি। যদিও কাল আমি সাত নম্বর বিভাগের সচিব, তবু আজ আমি কপর্দ্দক-হীন, কারণ এখনও স্বরাজ-কপর্দ্দক তৈরী হয় নি। ইংরেজের নোটের দাম কাল থেকে ত একটা আধলাও নয়; সেই জন্য

অফিসও যাইনি। এত কথা বলবার কারণ এই যে 'ভট্চাযোর চা' ফুরিয়ে গেছে, ঘি-ময়দার অবস্থা-ও তাই।"

সবাই ব'লে উঠ্লো "তা'তে আর কি হ'য়েছে? তা'তে আর কি হয়েছে?"

তখন অনেকটা সপ্রতিভ ভাব নিয়ে প্রকাশ বল্তে লাগ্লো "আজ আর আহার নিদ্রার কি প্রয়োজন? রাত বারোটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাক্। ইংরেজের ভাব-গতিক ত বদ্লাবে ব'লে আর কোনো আশা নাই। সন্ধ্যেবেলার যতগুলো এক পয়সার টেলিগ্রাফ্ স্পেশাল বেরোয় সবই কিনেছি; এইমাত্র শেষ আধুলিটা পাশের বাড়ী থেকে চারবার টেলিফোন ক'রে খরচ করেছি—কিন্তু কই ইংলণ্ড থেকে কোনো কেব্ল্ এখনো এলোনা!"

কিন্তু বিমলবাবু বল্লেন "ওহে অত সোজা নয়; চ'লে যাও বল্লেই সুট্ সুট্ ক'রে ব্যাগ-বিছানা গুটিয়ে চ'লে যাবে, তা ভেবো না।"

প্রকাশ বল্লে, "আমরা যে ঠিক তাই ভাবছি এ কথা কে বল্লে? ওদের স্বরাজ না দিয়ে আর উপায় কি? আর যদিই নেহাত না দেয় তবে আজ রাত্তির বারোটার পর আর কে আট্কাবে?"

এই ভাবে কিছুক্ষণ আজে-বাজে বাগ্-বিতণ্ডা চল্লো। যা হোক রাত্তির ন'টার মধ্যে সকলেই যে যার কর্ত্তব্য ঠিক ক'রে ফেল্লে। স্থির হ'ল যে বারোটা বাজতে পনেরো মিনিটের সময় সবাই হেদোর ধারে জমা হবে; তারপর মিছিল ক'রে যতক্ষণ না অন্যান্য দলের সঙ্গে দেখা হয় ততক্ষণ গড়ের মাঠের দিকে এগুতে থাকবো।

শেষ পর্ব্ব

অনিংরাজ-নির্ম্মিত 'এ্যান্সোনিয়া' টাইম্পিস্টায় সাড়ে এগারোটার সময় এ্যালার্ম্ম লাগিয়ে প্রকাশ বিছানায় শুয়ে কেবল এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। কমলা প্রথমটায় মনে করলো হয়তো মশা কামড়াচ্ছে। প্রকাশকে বল্লে, ওগো তোমার 'ভিটামিনে' একটা চন্দন-ধূপ পুঁতে জ্বেলে দোবো নাকি ? প্রকাশ একদিন কমলাকে বিশদভাবে আলুর খোসার সারবত্তা বোঝাতে গিয়ে ভিটামিন-তত্ত্ব পেড়েছিল। ফলে সেই দিন থেকে মূলো, পুঁই-শাক, লাল-আটা, পাতি-নেবু সম্বন্ধে উল্লেখ করতে হলেই কমলা 'ভিটামিন্' বলতো। এখানে ধূপ-দানীর অভাবে এক টুকরো মূলোতে ধূপ পোঁতার কথাই কমলা বলছিল) প্রকাশ উত্তরে শুধু বল্লে, Uneasy lies the head that wears the crown, Kamala ! অর্থাৎ ;—কমলা, ঘাড়ে দায়িত্ব যখন চাপে তখন শান্তি কি স্বস্তি আর থাকে না ! মশার চেয়েও বড় জিনিষ আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে !" কিন্তু কমলা যখন ভয় দেখালে যে প্রকাশের মাথায় জল ঢেলে সে এবার পাখা করতে আরম্ভ ক'রে দেবে তখন প্রকাশকে লেপের মধ্যে লুকিয়ে ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থাকতে হ'ল। কিন্তু এই ভান শেষ হয়ে কখন যে সত্যিকারের ঘুম এসে তাকে অভিভূত করে ফেল্লে তা সে নিজেও জান্লে না, কমলাও জান্লে না। দরজায় একটা জোর খটা-খট্ কড়া নাড়ার শব্দে প্রকাশ চম্কে উঠে চেঁচাতে লাগ্লো "কই গো ? শিগ্রী, লাঠিটা ? পাগ্ড়ী ? নাগ্রা ?—কে বিপিন ?........"

হাতময় কয়লা মেখে কমলা ঘরের মধ্যে ছুটে এসে বল্লে, "কি হোলো ? তোমার আবার হোলো কি ?" প্রকাশ—"এ্যাঁ,

এ কি ? সকাল হয়ে গেছে ? ঘড়িটার কি হোলো ? এ্যালার্ম্ম বাজে নেই ?" কমলা একটু হেসে বল্‌লে, "দায়িত্বের চাপে তুমি এমন ঘুম ঘুমুচ্ছিলে যে এ্যালার্ম্ম্‌ বাজাতে তুমি সেটাকে ঘুম-পাড়ানো গানের মত মনে ক'রে, আরও জোরে নাক ডাকাতে শুরু ক'রে দিলে। আমি ভাবলুম, তোমার ঘাড়ে দায়িত্ব, মনে অশান্তি আর অস্বস্তি, চোখে গাঢ় ঘুম, নাকে আরও গাঢ় গর্জ্জন—তোমাকে আর ওঠাবোনা ; বিশেষ ক'রে যখন স্বদেশী দামামা-কাড়ার শব্দ শত চেষ্টাতেও হেদোর ধার থেকে শুনতে পেলুম না।"

বাইরের কড়াটা আবার জোরে জোরে ন'ড়ে উঠ্‌লো। কপাটটা যেন ভেঙে ফেল্‌তে চায় ! প্রকাশ চেঁচিয়ে উঠ্‌লে—"যা-আ-আ-ই !!" অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় কমলাকে বল্‌লে "তুমি সব মাটি ক'রে দিয়েছ," হায় ! হায় ! এ্যালার্ম্ম্‌ বাজ্‌তে তুমি উঠ্‌লে আর আমাকে ওঠালেনা ? দেশের কাজে এতদিন লেগে থেকে শেষ মুহূর্ত্তেই লেট্ ?"

মুখে-চোখে কোনোমতে জলের ছিটে দিয়ে, প্রকাশ হন্ত-দন্ত হয়ে সদর দরজা খুল্‌তেই সুমুখে যা'কে দেখ্‌লে, সে বিপিন বাবুত নয়-ই—বিপিন বাবুর চোদ্দ পুরুষের সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। যে মহাপ্রভু সকাল বেলায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি পাগ্‌ড়ী সমেত পাক্কা সাড়ে ছ'ফুট একটি কাবুলিওয়ালা। এ লোকটির সঙ্গে স্বদেশী-ওয়ালার কোনো সম্পর্কই ছিল না, প্রকাশেরই কথামত এ 'একত্রিশে ডিসেম্বর নাইন্‌টিন্ টোয়েন্টিনাইনের' পরের দিন তার সুদের একচল্লিশটি টাকা নিতে এসেছিল। প্রকাশ তাকে একটু বসিয়ে রেখে

বাড়ীর ভেতর যখন জামাটা গায়ে দিয়ে আস্‌বার জন্তে ঢুক্‌লো তখন কমলা তা'কে জিগ্যেস্‌ করলে "কি গো? লেট্‌ হ'য়ে গেছ ব'লে ডাক্‌তে এসেছে নাকি?"

কথাগুলো গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে প্রকাশ কাবুলি-ওয়ালাকে সঙ্গে ক'রে, বুকের মধ্যে একরাশ আশা, আশঙ্কা, আনন্দ ও দুর্ভাবনা নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে প'ড়লো। সেদিনের তারিখ হ'য়ে গেছে পয়লা জানুয়ারী ১৯৩০!

লেডিজ রিষ্ট্-ওয়াচ্

একটি পরিচ্ছন্ন বোর্ডিং হাউসের তেতলায় একখানি মাত্র ঘর। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ ছাদ; ঋজু ঋজু চারটা জানালা; ঘরের মেঝেতে মার্ব্বল্ স্ল্যাব্; চার দিকে জাপানী পরদা, সাম্‌না-সাম্‌নি দু'খানা সিনারির পেন্‌সিল স্কেচ্; ঘরটি প্রশস্ত। এক কোণে অয়েল-ক্লথ্ আঁটা টি-পয়ের ওপর দুধের মত সাদা টি-সেট্; আর এক কোণে একটি ছোট রাইটিং-টেব্‌লের ওপর একটা পোর্টেব্‌ল্ টাইপ-রাইটার; ছাপানো চিঠির প্যাড্, কার্ব্বণ পেপার, কপি-শীট্, পিন-কুশান্, গাম্-পট্—একেবারে একটি ছোট খাটো রেগুলার্ অফিস্! আর এক দিকে, একটা বেতের শেল্‌ফে দু'তিন রকমের খবরের কাগজ। ঘরের অন্যান্য আসবাবও ঘরের মালিকের সৌখীন রুচির পরিচায়ক। লতিন বোস্ একটা খবরের কাগজের একশো টাকা মাইনের নাইট্-সাব্-এডিটার্। দেশে পনেরটি করিয়া টাকা পাঠাইলেই সে এক মাসের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারে। সুতরাং বাকী পঁচাশী টাকা, এবং, রাত্রে নাইট্-সাব্-এডিটারীর আট ঘণ্টা ও দিবা নিদ্রার চারঘণ্টা বাদ দিয়া, দিনের বাকী বারো ঘণ্টার সে একচ্ছত্র সম্রাট্

চাকুরী ছাড়া কাজ সে আরো অনেক কিছুই করে। সকাল বেলায় যে ক'খানা খবরের কাগজ আসে, অখণ্ড মনোযোগের সহিত সে তাহাদের 'ওয়ানটেড্,' 'ম্যাট্রিমোনিয়াল্' প্রভৃতি কলম্গুলো শেষ করে। তারপর চাকর আসিয়া চা-টোষ্ট্ দিয়া যায়। গড়গড়ায় সুগন্ধী গয়ার তামাক পুড়াইয়া সে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগায়। ক্রমশঃ তাহার চিন্তা রঙীন হইয়া উঠে, এবং কখনো পদ্যে কখনো গদ্যে সেই চিন্তাগুলি রূপ পাইয়া যথাসময়ে মাসিক-পত্রিকার অঙ্কে স্থান লাভ করে।

লতিন বোসের বয়স সাতাশ। জীবনে নিশ্চয়ই একটা রোমান্স্ ঘটিবে, এই দৃঢ় আশার বশবর্ত্তী হইয়া সে আজিও বিবাহ করে নাই। কিন্তু আশা নাকি মরীচিকার মত মায়াবিনী। সুতরাং জলের ছবি দেখিতে দেখিতেই সে 'সাহারা'-'গোবী' পার হইয়া আসিতেছে! কিন্তু সাহারারও ও শেষ আছে। সেই জন্যই বোধ হয় 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের' ট্যাঙ্কের ধারে সে একদা একটি লেডিজ্ রিষ্ট্-ওয়াচ্ কুড়াইয়া পাইল। কবি লতিন বোস্ সেটি হাতে করিয়া মনে মনে ভাবিল,—এতো শুধু রিষ্ট্-ওয়াচ্ নয়; এ যেন একটি মধুর কাব্য! ইহাতে বার্ণস্-এর জ্বালা, শেলীর স্বপ্ন, বায়রনের আবেগ, সমস্তই আছে! এক কথায়, লতিন ইন্স্পায়াড্ হইয়া পথ চলিতে লাগিল!

সেদিন সন্ধ্যায় লতিনের টাইপ্-রাইটার আধঘণ্টা ধরিয়া খটাখট্ করিল; রাত্রে তাহার অফিসের সাইকেল্ পিওন প্রত্যেক খবরের কাগজের নামে বিলি করিবার জন্য একখানি করিয়া চিঠি পাইল।

* * * *

পরের দিন সকালে বোর্ডিং-এর তেতলার ঘরটা ধূম্র-

প্রাচুর্য্যে আগ্নেয় গিরিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল! বিকশিত পদ্ম ফুলের মত স্নিগ্ধ মুখে লতিন লক্ষ্য করিল প্রত্যেক খবরের কাগজেই নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হইয়াছে :—

লেডিজ রিষ্ট্-ওয়াচ্

কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে!

যাহার ঘড়ি, তিনি ১২বি চিন্তামনি লেন-এ সকাল ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে আসিয়া প্রমাণ দিয়া লইয়া যাইতে পারেন॥

*   *   *   *

১২বি চিন্তামনি লেন-এ লতিনের বন্ধু অচিন্ত্য থাকে। সে দিনের বেলায় মেটিয়াব্রুজের একটা অফিসে সাড়ে তেত্রিশ টাকা মাইনের কেরানীগিরি সারিয়া, সন্ধ্যার পর চিৎপুর রোডের নবসংস্থাপিত একটি টকি-হাউসে ছ'টার ও ন'টার 'শো'তে টিকিট বিক্রয় করে। যাহাকে ভালবাসিত তাহার সহিত বিবাহ না হওয়ায় সে লতিনকে দিয়া কয়েকবার হা-হুতাশ ভরা কয়েকটা কবিতা লিখাইয়া কাগজে ছাপাইয়াছিল। তাহাতে তাহার কি সুবিধা হইয়াছিল সে খবর আমরা রাখি না কিন্তু সেই হইতে লতিনের জন্য সে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিত। সুতরাং লতিন যখন বলিল "ভাই তোমার বৈঠকখানাটা আমায় দিন কতক সকালে ব্যবহার করবার জন্যে দিতে পার?" তখন অচিন্ত্য নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিল। কেবল সঙ্কুচিত ভাবে সে স্মরণ করাইয়া দিল যে তাহার বৈঠকখানাটা বৈঠকখানা নামের অপমান; ছোট্ট একখানা কুঠারী, আলো নাই, বাতাস নাই, তাহাতে

কি লতিনের মত সৌখীন লোক পাঁচ মিনিটও বসিতে পারিবে ?—লতিন বলিল "সে সব ঠিক ক'রে নোব 'খন।"

বাসি মাছের-ঝাল দিয়া টাট্‌কা আলুভাতে-ভাত সাড়ে সাতটার মধ্যে গো-গ্রাসে গিলিয়া অচিন্ত্যকে মেট্রোপলিটান সময় এ্যাটেন্‌ডেন্স্‌ দিতে হয়। সুতরাং পরদিন বায়োস্কোপের টিকিট বিক্রয় সারিয়া সে যখন রাত্রি এগারোটার সময় দু'-পয়সা চার-পয়সার 'ভোজনালয়ে' আহারান্তে নিজের সেই 'কম্বাইণ্ড্‌' বৈঠকখানা-বেড্‌-রুমে প্রবেশ করিল তখন সন্দেহ হইতে লাগিল যে ঘরখানি সেই তাহারই 'ঘন-তমসাবৃত' কুঠারী কিনা? ঘরখানিতে লাইট আসিয়াছে, ফ্যান্‌ আসিয়াছে, আর আসিয়াছে দুইটি সুন্দর চেয়ার ও একখানি ছোট টেবিল।

—দুই—

লতিনের হাতের সোনার ঘড়িটায় ন'টা বাজিয়া সাঁইত্রিশ হইয়াছে; অচিন্ত্য অনেকক্ষণ অফিস্‌ গিয়াছে; আগের দুই দিনের মতই বুঝি আজকের দিনটাও কাটিয়া যায়! সতৃষ্ণ নয়নে লতিন জানালার দিকে চাহিয়া! হঠাৎ দুইটি গরাদের উপর দুইখানি হাত, একটু পরেই একটি নেড়া-মাথা ও তাহার পশ্চাতে একটি পুরুষ্টু টিকি দেখা দিল। লতিন গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে বাবা তুমি?" ঘড়-ঘ'ড়ে গলায় উত্তর আসিল "বাবু বারর বি নম্বর এই বাড়ী অছি?" "হ্যাঁ বাবা, অছি—তাতে কি হয়েছে?" "মোর মুনিব দেখা করিবাকু আউছন্তি" লতিন বলিল "হ্যাঁ- এইটেই বারর বি, যা তোর দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয়।"

লতিন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—একটি ব্রীড়া-কুণ্ঠিতা তরুণী,

গাড়ীর ভিতর হইতে সাগ্রহে চাকরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। দুই হাতে দুইখানি উজ্জ্বল সরু বালা। বাম হাতে যেখানটায় রিষ্ট্-ওয়াচ বাঁধা থাকিত সেখানটায় একটি অস্পষ্ট ষ্ট্র্যাপের দাগ। পরনে মেঘ-ডুম্বুর সাড়ী। কালো চুলের এলায়িত বেণী, না বেণী নয়—এলো খোঁপা। পায়ে জরী দেওয়া নাগ্‌রা—না স্যাণ্ডেল্,—লতিনের পাদুকা-নির্ণয় করা আর হইল না। সেই ওড্র-কুলোদ্ভব ভৃত্যের পশ্চাতে পশ্চাতে যিনি আসিলেন তাঁহার না ছিল বেণী, না ছিল এলো খোঁপা, না ছিল পরণে মেঘ-ডুম্বুর সাড়ী!—গায়ে একটা আধ-ময়লা তালি-মারা জিনের কোট, পরনে একখানি মোটা সাড়ে ন'হাতি. চরণে এক জোড়া হড্-বার্ণিশের সাইড্-স্প্রিং দেওয়া জুতা, ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, কুঞ্চিত ললাট, বছর-পঞ্চান্ন'র একটি বৃদ্ধ লতিনের সামনের চেয়ারটিতে অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই বসিয়া পড়িলেন। চোখ দু'টি মিট্ মিট্ করিয়া একবার এ-পকেট একবার ও-পকেট হাৎড়াইয়া পোর্সিলেন-এর মত পুরু কাঁচের চশ্‌মা কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে লতিনকে সম্বোধন করিয়া আগন্তুক বলিলেন,—"বাবা, তুমিই কি রিষ্ট-ওয়াচের বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলে?" লতিনের চোখের সুমুখে ঘরখানা দুলিয়া উঠিল, টেবিল-চেয়ার-লাইট-ফ্যান নাগর-দোল্লার মত ঘুরিতে লাগিল, ঘর সাজাইবার টাকা-পঞ্চাশটা বৃত্তাকারে নৃত্য করিতে লাগিল;—আকাশ-কুসুমগুলি হঠাৎ কে যেন আঁকশী দিয়া মাটিতে পাড়িল! আশাবাদী লতিন বৃদ্ধকে দেখিয়াও হতাশ হয় নাই; ভাবিয়াছিল, এ হয় ত অচিন্ত্যের কোনো আত্মীয় হইবে, অথবা অন্য কোনো কাজে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়া থাকিবে। কিন্তু একেবারে লেডিজ রিষ্ট-ওয়াচ্‌টারই খোঁজ! এবং এই কুৎসিৎ কদাকার বৃদ্ধ! শুষ্ক-মুখে

লতিন বলিল (সে তখনও আশা ছাড়ে নাই) "হ্যাঁ, বিজ্ঞাপনটা আমিই দিয়েছিলাম ; তা রিষ্ট-ওয়াচ্‌টা কি আপনার কোনও আত্মীয়ার ?" বলিয়া, শক্ত অপারেশনের পূর্ব্বে ফলাফলের জন্য উৎকণ্ঠিত লোক যেমন ভাবে তাকাইয়া থাকে, লতিন সেই ভাবে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

টেবিলের উপর মাথাটা আর একটু বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আগন্তুক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন "দেখুন, আমি জিনিষ-পত্র বাঁধা রেখে টাকা ধার দিয়ে থাকি। এই আমার ব্যাবসা ; (লতিন মনে মনে বলিল,—'তা চেহারা দেখেই বুঝেছি') আজ মাস দেড়েক হ'ল বারোটি টাকার বদলে ঐ ঘড়িটা একজন বাঁধা রেখে গেছে। আজ পর্য্যন্ত না এল ঘড়িটা নিতে, না দিয়ে গেল টাকার সুদ। ভবানী-পুরের একটা ঠিকানা দিয়ে গেছে, মিথ্যে কি না জানি না ; 'মিড্-ডে' ফেয়ারে চারটে পয়সা নগদ খরচ ক'রে—সেই কালীঘাট, মশাই ! ঘুরে ঘুরে মিড্-ডে ফেয়ারের সময় উৎরে গেল, সন্ধ্যে হ'য়ে এল, ঠিকানা আর খুঁজে পেলুম না, ভাবলুম চারটে পয়সা ত গেছেই ; আরও ছ'টা কেন যায়, তার চেয়ে হেঁটেই বাড়ী ফিরি—কিন্তু মশাই আর কি সে বয়েস আছে যে হেঁটে কালীঘাট-শ্যামবাজার কর্‌বো ? মাঝখানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একটু জিরিয়ে নিতে গেলুম তাতে পায়ের ব্যথা গেল আরও বেড়ে—সেই ট্রামে উঠ্‌তে হ'ল—বুড়ো মানুষ, কখন, কোথায়, আর কি করে' যে ঘড়িটা হারালুম জান্‌তেও পারিনি। খেয়াল হ'ল একেবারে ধর্ম্মতলার মোড়ে, কণ্ডাক্‌টার যখন টিকিটের পয়সা চাইলে।........." আরও কতক্ষণ এই ভাবে চলিত কে জানে, লতিন হঠাৎ বলিয়া উঠিল "আচ্ছা ঠিকানাটা আমায় দিন, আর আপনার সুদে-

আসলে যে টাকাটা পাওনা হয়েছে নিন্। ঘড়িটা নিয়ে, যাঁর ঘড়ি আমি নিজেই তাঁকে খুঁজে বের ক'রে দিয়ে আস্‌বো।"

"আঃ, বাঁচালে বাবা!"

বৃদ্ধের ঠিকানাটা পর্য্যন্ত লতিন জানিয়া লইতে ভুলিয়া গেল! রোমান্সের আশায় তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

* * * *

আজ ক'দিন ধরিয়া লতিন সেই বৃদ্ধের দেওয়া ঠিকানার খোঁজে ভবানীপুরের নূতন রাস্তাগুলি চষিয়া বেড়াইয়াছে। শেষে তাহার উদ্যম সফল হইল। কম্পিত-বক্ষে নম্বর মিলাইয়া লইয়া কড়া নাড়িতেই বামাকণ্ঠে উত্তর আসিল "কা'কে চাই?" লতিন বলিল, "একবার দরজাটা খুল্‌বেন; বিশেষ দরকার আছে।" সিঁড়ি দিয়া চটাপট্ নামিবার শব্দ আসিতে লাগিল। লতিনের মনে আর একবার ভাসিয়া উঠিল,—এলো খোঁপা, মেঘ-ডুম্বুর সাড়ী ও বার্ম্মিজ্ স্যাণ্ডেল্—। দূর্ ছাই! সে আর কিছুই ভাবিবে না; যদি আবার হতাশ হইতে হয়! কিন্তু এবার ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন হইল! যিনি দরজা খুলিয়া দেখা দিলেন তিনি কবি লতিন বোসের মানসীর মত না হইলেও তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইবার যোগ্যা।

রোমাঞ্চিত লতিন কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "হেমদা বাবু কি এখানে থাকেন?" লতিনের উৎকণ্ঠিত আগ্রহের ভাব দেখিয়া তরুণীটি কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ছিলেন বটে, তবে আমরা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গেছেন।" আরও একটু অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া তরুণীটি যেমন

আসিয়াছিলেন তেমনই চলিয়া গেলেন। দরজার বাহিরে পড়িয়া রহিল আমাদের কবি লতিন বোস্ এবং তাহার বিভ্রান্ত চোখের সম্মুখবর্ত্তী টল্‌টলায়মান্ বিশ্ব-জগৎ !

তখন লতিন বোস্, তাহার বন্ধু এইচ, কে, দে,—"ওয়াচ-মেকার্স এ্যাণ্ড জুয়েলার্সের" দোকানে পদার্পণ করিল। কিন্তু এইচ্, কে, দে, ওর্‌ফে হরিকুমার দে, সমস্ত ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বলিল, "লতিন বাবু, এ ঘড়িটা কি কর্‌তে এনেছেন ? কেস্‌টা ত নিকেলচটা রোল্ড-গোল্ডের, আর কেসের ভেতরটা ত একেবারে ফাঁপা !"......

লতিন আর বৃথা রোমান্সের জন্য অপেক্ষা না করিয়া পরবর্ত্তী ফাল্গুনেই বিবাহ করিয়া ফেলিল।